قال الله تعالى وما اتبكم الرسول فخذوه ق ومانهبكم عنه فانتهوا ج

মা'আরিফুল হাদীস

হাদীসে নববীর এক নতুন ও অনুপম সংকলন

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ

প্রথম খন্ড

কিতাবুল ঈমান

সংকলন ঃ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ

হাফেয মাওলানা মুজীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস, মাদরাসা দারুল উলূম

মিরপুর-৬, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর যে অগণিত দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি তাদের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য নবুওয়ত ও রেসালতের মহান ও মুবারক ধারা চালু করেছেন এবং যখনই মানবজাতির জন্য আসমানী হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখন তাদের মধ্য থেকেই কোন এক বান্দাকে নিজের নবী এবং তাদের পথপ্রদর্শক বানিয়ে আপন হেদায়াতসহ তাদের মধ্যে প্রেরণ করে দিয়েছেন।

নবী-রাসূলদের আগমনের এই ধারা হাজার হাজার বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অবশেষে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই ধারাকে সমাপ্ত করে দেওয়া হয় এবং তাঁর মাধ্যমে সেই সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও হেদায়াত প্রেরণ করা হয়, যা সর্বকালের জন্য যথেষ্ট।

আসমানী শিক্ষা ও হেদায়াতের যে মহাসম্পদ খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এই জগত লাভ করেছে, এর দু'টি অংশ রয়েছে। একটি আল্লাহ্র কিতাব কুরআন মজীদ, যা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই আল্লাহ্র কালাম। দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব বাণী এবং তাঁর সকল বাচনিক ও বাস্তব কর্মধারা সংক্রান্ত শিক্ষা ও পথনির্দেশ, যা তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর কিতাবের শিক্ষক ও ব্যাখ্যাতা এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিনিধি হিসাবে উম্মতকে দান করতেন। সাহাবায়ে কেরাম এগুলো সংরক্ষণ করে উম্মতের পরবর্তী লোকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং পরবর্তী লোকেরা এগুলো পূর্ণ বর্ণনা পরম্পরার সাথে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ করে নিয়েছেন। তাঁর এ শিক্ষা ও পথ নির্দেশের শিরোনাম হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিজের স্বাভাবিক জীবন কাটিয়ে আল্লাহ্র ফায়সালা অনুযায়ী এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন; কিন্তু বিশ্বমানবের চিরকালীন পথপ্রদর্শনের জন্য নিজের আনীত শিক্ষা ও হেদায়াতের এই দু'টি অংশ অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহকে রেখে গিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি বিষয়কে (নিজ নিজ স্তর অনুযায়ী) প্রত্যেক যুগে সংরক্ষিত ও সমুজ্জ্বল রাখার এমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা করেছেন যে, চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এটা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক

বিরাট নিদর্শন এবং খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জেযাসমূহের মধ্যে এক বিরাট মু'জেযা।

আল্লাহ্‌র এসব ব্যবস্থার মধ্যে একটি ব্যবস্থা এই যে, যুগের চাহিদা অনুযায়ী কুরআন ও হাদীসের যে ধরনের খেদমতের প্রয়োজন দেখা দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিছু বান্দার অন্তরে এর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দিয়ে তাদেরকে এই খেদমতের প্রতি মনোযোগী করে দেন। নবী-যুগ থেকে শুরু করে এই কাল পর্যন্ত কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন খেদমত যেসকল ধারায় সম্পন্ন করা হয়েছে, (কেউ চিন্তার দৃষ্টিতে দেখলে সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, এসব যা হয়েছে) সেটা প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের এক খোদায়ী ব্যবস্থাপনাই ছিল, আর যেসকল বান্দার মাধ্যমে এই খেদমত সম্পন্ন হয়েছে, তারা যেন কেবল যন্ত্রের ভূমিকায় ছিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা যদিও খুবই চিত্তাকর্ষক ও ঈমান উদ্দীপক, কিন্তু খুবই দীর্ঘ। আর জ্ঞানীদের জন্য যেহেতু এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট, তাই আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে বলতে চাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে আমাদের এ যুগে এবং আমাদেরই দেশে তাঁর কিছু বান্দাকে দিয়ে কুরআন মজীদের এমন খেদমত করিয়েছেন, যা যুগচাহিদার দাবী ছিল। আল্লাহ্‌র শোকর যে, ঐসব বান্দার পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা ঐ সময়ের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। তদ্রূপভাবে আজ থেকে প্রায় বার বছর পূর্বে (১৩৬১ হিজরীতে) এই অধম বান্দার অন্তরে এ চিন্তা আসে যে, এই যুগের বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে উর্দু ভাষায় হাদীসে নববীরও একটা খেদমত করা হোক। আর এর জন্য প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহের (ছেহাহ সিত্তা অথবা মেশকাত শরীফ ইত্যাদি) মধ্য থেকে কোন একটির ব্যাখ্যা লিখার পরিবর্তে এটা অধিক উপযোগী মনে হল যে, হাদীসে নববীর একটা মধ্যম ধরনের নতুন সংকলন এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পৃথকভাবে সাজানো হোক এবং এ যুগের সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাগত এবং চিন্তাগত অবস্থা এবং এরই সাথে বর্তমান যুগের বিশেষ বিশেষ একাডেমিক চাহিদাকে সামনে রেখে সাধারণবোধ্য ভাষায় হাদীসগুলোর ব্যাখ্যাও করা হোক। তারপর সে ইচ্ছা অনুযায়ী এ কাজের একটি চিত্র ও মাপকাঠি সামনে রেখে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সে বছরই এ কাজ শুরুও করে দিলাম। কখনো কখনো মাসিক 'আল ফুরকানে' এর কোন কোন অংশ 'মা'আরিফুল আহাদীস' শিরোনামে প্রকাশিতও হতে থাকে।

কিন্তু সেই বছরগুলো অধমের এ অবস্থা ছিল যে, কাজের গতি খুবই মন্থর থাকে; বরং মাঝে অনেক সময় এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি এ কাজের প্রতি কোন মনোযোগই দিতে পারিনি। আমি তখন নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম যে, এ কাজটি হয়তো কোন উল্লেখযোগ্য সীমা পর্যন্তই পৌঁছাতে পারবে না; কিন্তু যিনি কাজ নিবেন তাঁর ফায়সালা ছিল কাজ নেওয়ার। তাই একাধিকবার ভাঙ্গন ও মাঝে কয়েক বছরের বিরতি সত্ত্বেও কিছু কিছু কাজ হতেই থাকে। যার ফলে এই প্রথম খন্ড যা এখন ছাপা হচ্ছে, এখন থেকে দেড় বছর পূর্বেই এর কাজ একরকম শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর নিরীক্ষণ কাজের সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হল। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এ কাজও হয়ে গেল। সবশেষে আল্লাহ্ তাঁর অপার অনুগ্রহে ছাপানোর কাজও সহজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা যদি এ কিতাবটি সমাপ্ত করার তওফীক দান করেন, তাহলে আমার মস্তিষ্কে এর যে খসড়া রয়েছে, সেই হিসাবে এ ধরনের আরো পাঁচটি খন্ডে কিতাব শেষ হবে ইনশাআল্লাহ্।

এ কিতাবের প্রথম খন্ডটি হচ্ছে কিতাবুল ঈমান। এতে কেবল ঐসব হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেগুলো ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে কেয়ামত, আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত হাদীসগুলো অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হলেও আমি কিতাবুল ঈমানের মধ্যেই এগুলোর আলোচনা বেশী উপযোগী মনে করেছি এবং সেই হিসাবে এগুলোকে কিতাবুল ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছি। তাই এই খন্ডের অর্ধেক হাদীসই মৃত্যুপরবর্তী বিষয়াবলী অর্থাৎ বরযখ, কবর, কেয়ামত, আখেরাত এবং সেখানে সংঘটিত ঘটনাবলী যেমন হিসাব-কিতাব ও জান্নাত-জাহান্নামের সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলো ঐসব হাদীস, যার দ্বারা শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এর বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা জানা যাবে।

এ কিতাবে উল্লেখিত হাদীসসমূহ অধিকাংশই মেশকাত শরীফ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কেবল শুরুর দিকে ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কয়েকটি হাদীস এমন রয়েছে, যেগুলো মেশকাত থেকে নেয়া হয়নি; বরং সরাসরি ঐসব কিতাব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেখান থেকে মেশকাতের হাদীস সংকলন করা হয়েছে। তাই এ কিতাবের কোন হাদীস যদি মেশকাতে পাওয়া না যায় অথবা মেশকাতে উল্লেখিত এবং এই কিতাবে উল্লেখিত হাদীসের শব্দমালায় যদি কোন পার্থক্য দেখা যায়, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, এই হাদীসটি সরাসরি মূল কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে।

পাঠকদের সুবিধার জন্য হাদীসগুলোকে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, এগুলোর অধিকাংশ শিরোনাম হাদীসের মর্ম ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পাঠকদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। কিতাবটি যেহেতু সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য লিখা হয়েছে, তাই হাদীসসমূহের বিন্যাস ও ক্রমবর্ণনায় রেওয়ায়তের স্তর ও বিশুদ্ধতার স্তরের দিকে লক্ষ্য না করে এ দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্ম উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে এই বিন্যাসই যেন পাঠকদের জন্য সহায়ক হয়ে যায়। তদুপরি কোন হাদীসগ্রন্থ অধ্যয়ন করার সময় সর্বদা এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কিতাবটির সংকলক যে ক্রমধারায় হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, এটা সংকলকের নিজের মত ও রুচিবোধের ব্যাপার। অন্যথায় প্রতিটি হাদীসই স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটি উপদেশ ও শিক্ষা। এ বিষয়টিও সম্ভব যে, কোন হাদীসগ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় এবং একই শিরোনামে আনীত দু'টি হাদীসের মধ্যে একটি নুবুওয়তের সূচনালগ্নের হবে, আর দ্বিতীয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনের হবে।

হাদীস অধ্যয়নকারীদের আরেকটি বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অধিকাংশ হাদীসই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসী বক্তব্য ও উপদেশ বিশেষ। অথবা তাঁর সামনে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর অথবা কোন সাময়িক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত দিক-নির্দেশনা ও

সতর্কবাণী। তাই ঐ ক্ষেত্র, পরিবেশ এবং শ্রোতাদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে এগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনায় না রেখে সাধারণ লিখকদের রচিত বইপত্রের মত যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। আর এই সূক্ষ্ম বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখলে ইনশাআল্লাহ্ কোন জটিলতা ও প্রশ্নের সৃষ্টি হবে না।

যেহেতু এই সংকলনটির আসল উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভান্ডারে সংরক্ষিত শিক্ষা ও হেদায়াতকে এই যুগের সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের জন্য নবীর অনুসরণের পথ সহজ করে দেওয়া, তাই হাদীসের অনুবাদ বাক্যবিন্যাস ও শাব্দিক তরজমার অনুসরণ করাকে জরুরী মনে করা হয়নি; বরং হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্মকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ জন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভাষাও যথাসম্ভব সহজ ব্যবহার করা হয়েছে।

যেসব হাদীসের ব্যাপারে কোন মহলে ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে অথবা কোন কোন ভ্রান্তবিশ্বাসী লোক এসব হাদীসের দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে থাকে, এগুলোর ব্যাখ্যার বেলায় এ ধরনের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, কোন কোন হাদীসে কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার উপর জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে অথবা প্রত্যেক কালেমা পাঠকারীর উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোন কোন হাদীসে এমন ব্যক্তিকে কাফের বলতে নিষেধ করা হয়েছে, যে মুসলমানদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশ্ত খায় ও তাদের কেবলার অনুসরণ করে। আবার এর বিপরীত কোন কোন হাদীসে কোন কোন গুনাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা এতে লিপ্ত হয় তারা মুসলমানই থাকে না এবং ঈমানের মধ্যে তার কোন অংশই নেই। মোটকথা, এ ধরনের জটিল ও ব্যাখ্যাযোগ্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলার তওফীক ও তাঁর বিশেষ সাহায্যে এমনভাবে করা হয়েছে যে, এটা অধ্যয়ন করার পর ইনশাআল্লাহ্ কোন বিভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না। তবে কারো ভাগ্যে যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত ও সুমতি নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

হাদীস নং ১ থেকে ৭০ পর্যন্ত কোন শিরোনামের অধীন মূল হাদীসের পূর্বে কোন সূচনা বক্তব্য লেখা হয়নি এবং এর প্রয়োজনও মনে করা হয়নি। কিন্তু পরের যে হাদীসগুলো বরযখ জগত, কবরের আযাব এবং কেয়ামত ও আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট, এগুলো বুঝানোর জন্য মূল হাদীসের পূর্বে যেখানে যেখানে ভূমিকা ও ব্যাখ্যামূলক নোট লেখার প্রয়োজন মনে করেছি, সেখানে এই ধরনের নোট লিখে দিয়ে পাঠকদের চিন্তাকে পরিষ্কার ও দ্বিধামুক্ত করার চেষ্টা করেছি। বস্তুতঃ বরযখ, কেয়ামত, পুলছিরাত, মীযান, হাউযে কাউছার, শাফাআত, জান্নাত, জাহান্নাম এবং দীদারে এলাহী ইত্যাদি বিষয়াবলী সম্পর্কে যে বিস্তারিত ভূমিকামূলক নোট লিখে দিয়েছি, আশা করা যায়, পাঠকদের জন্য এটা চিত্তের প্রশান্তি ও ঈমান বৃদ্ধির কারণ হবে ইনশাআল্লাহ্ ।

শেষ নিবেদন

সম্মানিত ও ভাগ্যবান পাঠকদের খেদমতে আমার নিবেদন এই যে, হাদীসের অধ্যয়ন যেন কেবল জ্ঞান চর্চা হিসাবে না করা হয়; বরং এটা করতে হবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজের ঈমানী সম্পর্ক তাজা করার উদ্দেশ্যে এবং আমল ও হেদায়াত লাভের নিয়্যতে। তাছাড়া হাদীস অধ্যয়নের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও ভালবাসাকে অন্তরে অবশ্যই জাগ্রত রাখতে হবে। হাদীস এভাবে পড়তে হবে এবং অন্যকে শুনাতে হবে যে, আমরা যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিসে উপস্থিত, তিনি হাদীস বলছেন, আর আমরা শুনে যাচ্ছি। এমন যদি করা হয়, তাহলে হাদীসের নূর ও হেদায়াত ইনশাআল্লাহ্ নগদে লাভ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই তওফীক দান করুন।

সকলের দো'আ প্রার্থী অধম ও গুনাহগার বান্দা
মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী
২২শে জুমাদাল উখরা ১৩৭৩ হিজরী
মোতাবেক ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ ইং

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিতাবুল ঈমান	
কেবল ঐ আমলই গ্রহণযোগ্য যা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয়	১
একটি ভ্রান্তির নিরসন	২
বিরাট নেক আমলও এখলাছশূন্য হলে উহা জাহান্নামেই নিয়ে যাবে	৩
কুরআন মজীদে মুখলেছ ও অমুখলেছের আমলের একটি দৃষ্টান্ত	৩
দুনিয়াতে বাহ্যিক অবস্থার উপর সকল ফায়সালা হয়ে থাকে, আখেরাতে নিয়্যতের উপর ফায়সালা হবে	৪
হাদীসটির বিশেষ গুরুত্ব	৫
ইসলাম, ঈমান ও এহসানের পরিচয়	৬
ফেরেশ্‌তাদের ব্যাপারে একটি সংশয় ও এর উত্তর	১০
একটি জ্ঞাতব্য বিষয়	১২
ইসলামের ভিত্তিমূল	১৫
ইসলামের বিধি-বিধান পালনের উপর জান্নাতের সুসংবাদ	১৬
ইসলামের বিধি-বিধানের দাওয়াত প্রদানে ধারাবাহিকতা ও ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে	২২
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না এবং তাঁর আনীত দ্বীনকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেবে না, সে নাজাত ও মুক্তি লাভ করতে পারবে না	২৫
সত্যিকার ঈমান ও ইসলাম মানুষের মুক্তির গ্যারান্টি	২৭
আরেকটি মৌলিক কথা, যার দ্বারা এ ধরনের অনেক হাদীসে উত্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তির নিরসন হয়ে যায়	৪১
ইসলাম গ্রহণের দ্বারা অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়	৪৩
ঈমান গ্রহণ করার পর মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যায়	৪৫
এ হাদীসসমূহের ব্যাপারে একটি সন্দেহ ও এর উত্তর	৪৮
ঈমান ও ইসলামের কয়েকটি বাহ্যিক নিদর্শন	৪৯
কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে মুসলমান কাফের হয়ে যায় না	৫০
দ্বীন ও ঈমানের বিভাগ ও এর শাখাসমূহ	৫১
ঈমানের কয়েকটি লক্ষণ	৫৩
ঈমানকে পূর্ণতা দানকারী উপাদানসমূহ	৫৪
ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক চরিত্র ও কর্মসমূহ	৬৪
কয়েকটি মুনাফেকসূলভ কর্ম ও চরিত্র	৬৮
মনে ওয়াসওয়াসা আসা ঈমানের পরিপন্থী নয় এবং এর জন্য শাস্তিও হবে না	৭০
ঈমান ও ইসলামের সারবস্তু	৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
তকদীরকে স্বীকার করাও ঈমানের অপরিহার্য শর্ত	৭৪
তকদীরের বিভিন্ন পর্যায়	৮২
তকদীর সম্বন্ধে কয়েকটি সংশয়ের নিরসন	৮৩
মরণোত্তর জীবন	
বরযখ, কেয়ামত ও আখেরাত	
কয়েকটি মৌলিক কথা	৮৫
বরযখ তথা কবর জগত	৮৭
কেয়ামত	৯৫
আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতি এবং আমলের পরীক্ষা	১০২
কেয়ামতে বান্দার হকের বিচার	১০৭
আল্লাহ্‌র নামের ওজন	১০৮
সহজ হিসাব	১০৯
মু'মিনদের জন্য কেয়ামতের দিনটি হাল্কা ও সংক্ষিপ্ত হবে	১০৯
আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণকারীরা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে	১১০
উম্মতে মুহাম্মদীর এক বিরাট সংখ্যা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে	১১০
হাউযে কাওছার, পুলসিরাত ও মীযান প্রসঙ্গ	১১১
শাফাআত প্রসঙ্গ	১১৬
জান্নাত ও এর নেয়ামতসমূহ	১২৫
জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্‌র স্থায়ী সন্তোষের ঘোষণা	১৩০
জান্নাতে আল্লাহ্‌র দীদার	১৩১
জাহান্নাম ও এর শাস্তি	১৩৫
জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়	১৪১

✪✪✪

কিতাবুল ঈমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ، وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدٰى وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ *

কেবল ঐ আমলই গ্রহণযোগ্য যা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয়

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِءٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَءَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ * (رواه البخارى ومسلم)

১। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের সকল কর্মকাণ্ড নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়্যত অনুসারেই ফলাফল লাভ করে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করে (আল্লাহ্ এবং রাসূলের সন্তুষ্টি বিধান ছাড়া এর পেছনে অন্য কোন কার্যকারণ থাকে না) তার হিজরত যথার্থই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকেই হয়। (নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতি হিজরতকারী হিসাবে পরিগণিত হয় এবং এ হিজরতের নির্ধারিত পুণ্য ও বিনিময় সে লাভ করবে।) অপর দিকে যে ব্যক্তি পার্থিব কোন

স্বার্থসিদ্ধি অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করে, (তার এ হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে পরিগণিত হবে না; বরং) সে বাস্তবে যে উদ্দেশ্যে হিজরত করল, আল্লাহ্র নিকট তার এ হিজরত সে উদ্দেশ্যেই ধরা হবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরে হাদীসটির যে অনুবাদ করা হয়েছে, এতেই এর মর্ম উদ্ধার হয়ে যায় এবং ভাবার্থ প্রকাশের জন্য এর চাইতে অধিক কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু হাদীসটির বিশেষ গুরুত্বের দাবী এই যে, এর অর্থ ও তাৎপর্যের উপর আরো কিছু লিখা হোক।

হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, উম্মতের উপর এই বাস্তব ও সত্য কথাটি তুলে ধরা যে, মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের শুদ্ধাশুদ্ধ এবং এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, পুণ্য কাজ বলে কেবল সেটাকেই ধরা হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সে কাজেরই মূল্যায়ন হবে, যা ভাল নিয়্যতে করা হবে। আর যে পুণ্য কাজ কোন হীন উদ্দেশ্যে ও খারাপ নিয়্যতে করা হবে, সেটা পুণ্য কাজ বলে গণ্য হবে না এবং আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্যও হবে না; বরং নিয়্যত অনুসারে সেটা অশুদ্ধ ও প্রত্যাখ্যাত হবে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও সেটা পুণ্য কাজই মনে হয়।

সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাজের সাথে নিয়্যতও দেখেন এবং বাহ্যিক অবস্থার সাথে অন্তরের অবস্থারও খবর রাখেন। তাই তাঁর দরবারে প্রত্যেক কাজের মূল্যায়ন আমলকারীর নিয়্যত অনুসারে করা হয়।

একটি ভ্রান্তির নিরসন

এখানে কেউ যেন এই ভুল ধারণা না করে যে, কাজের ফলাফল যেহেতু নিয়্যত অনুসারেই হয়ে থাকে, তাহলে কোন মন্দ কাজও ভাল নিয়্যতে করলে সেটা পুণ্য কাজ বলে গণ্য হয়ে যাবে এবং এর জন্য সওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন, কেউ যদি এই নিয়্যতে চুরি অথবা ডাকাতি করে যে, এর দ্বারা অর্জিত সম্পদ গরীব-মিসকীনের সাহায্যে ব্যয় করবে, তাহলে সে সওয়াবের অধিকারী হতে পারবে।

আসল কথা এই যে, যে কাজটি আদতেই মন্দ এবং যে কাজ করতে আল্লাহ্ ও রাসূল নিষেধ করেছেন, এমন কাজে ভাল নিয়্যতের প্রশ্নই আসতে পারে না। এগুলো সর্বাবস্থায়ই মন্দ এবং আল্লাহ্র ক্রোধ ডেকে আনে; বরং এমন খারাপ কাজে ভাল নিয়্যত করা এবং সওয়াবের আশা করা অধিক শাস্তির কারণ হতে পারে। কেননা, এটা আল্লাহ্র দ্বীন ও আহকামের সাথে এক ধরনের উপহাসের শামিল।

এখানে হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নেক আমল সম্পর্কে এ কথাটি বলে দেওয়া যে, নেক কাজও যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে সেটা আর নেক আমল থাকবে না; বরং অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে তার ফল মন্দই হবে। যেমন, যে ব্যক্তি নামায খুব একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে আদায় করে, যাকে আমরা অত্যন্ত উচ্চ স্তরের নেক আমল মনে করি, সেখানে লোকটি যদি একাগ্রতা ও বিনয়ভাব এই জন্য অবলম্বন করে যে, মানুষ এর দ্বারা তার দ্বীনদারী ও খোদাভীতি সম্পর্কে ভাল মানোভাব পোষণ করবে ও তার সম্মান করবে, তাহলে এই হাদীসের দৃষ্টিতে তার এ বিনয়ভরা ও একাগ্রতার নামাযেরও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন মূল্য নেই। অথবা এক ব্যক্তি কুফ্রের দেশ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করে যায় এবং হিজরতের সকল কষ্ট-মুসীবত বরণ করে নেয়; কিন্তু এই হিজরতের দ্বারা তার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ

অর্জন নয়; বরং এর মধ্যে পার্থিব কোন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে। যেমন, হিজরতের দেশে বসবাসকারী কোন মহিলাকে বিয়ে করার খাহেশ তাকে হিজরতে উদ্বুদ্ধ করল। এমতাবস্থায় এই হিজরত ইসলামের জন্য হিজরত হবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সে কোন প্রতিদানও পাবে না; বরং উল্টো সে গুনাহের ভাগী হবে। এটাই হচ্ছে এই হাদীসের মর্ম।

বিরাট নেক আমলও এখলাছশূন্য হলে উহা জাহান্নামেই নিয়ে যাবে

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র আদালত থেকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার ফায়সালা দেওয়া হবে। সবার আগে ঐ ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছিল। সে যখন আদালতে হাজির হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে তাকে নিজের নে'আমতরাশির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও এগুলো স্মরণ করে স্বীকার করবে। তারপর তাকে বলা হবে, বল তো! তুমি এগুলোর কি হক আদায় করেছ এবং কি কাজ করে এসেছ ? সে বলবে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার পথে জেহাদ করেছি এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো কেবল এই উদ্দেশ্যে জেহাদ করেছিলে যে, বীর বাহাদুর হিসাবে প্রসিদ্ধ হবে। আর দুনিয়াতে তো তোমার বীরত্বের আলোচনা হয়েই গিয়েছে। এরপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অনুরূপভাবে একজন দ্বীনের আলেম ও কুরআনের আলেমকে আদালতে হাজির করা হবে। তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি কি আমল করে এসেছ ? সে বলবে ঃ আমি তোমার দ্বীন ও তোমার কুরআনের জ্ঞান লাভ করেছিলাম এবং তা অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছিলাম। আর এসব তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি তো নিজেকে আলেম ও কারী হিসাবে প্রকাশ করার জন্য ওসব করেছিলে। তারপর আল্লাহ্র নির্দেশে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর আরেক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। তাকেও জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কি করে এসেছ ? সে বলবে, হে আল্লাহ্! আমি পুণ্য অর্জনের কোন ক্ষেত্রই অবশিষ্ট রাখিনি; বরং সকল খাতে তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি অর্থ ব্যয় করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি তো কেবল এই উদ্দেশ্যে তোমার সম্পদ ব্যয় করেছিলে যে, দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বড় দানশীল বলবে। আর দুনিয়াতে তো তোমার দানশীলতার খুব সুনাম হয়েই গিয়েছে। তারপর তাকেও উপুড় করে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। —মুসলিম

মোটকথা, আল্লাহ্র নিকট কেবল ঐ আমলই কাজে আসবে, যা বিশুদ্ধ নিয়্যতে অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করা হয়। দ্বীনের বিশেষ পরিভাষায় একেই এখলাছ বলা হয়।

কুরআন মজীদে মুখলেছ ও অমুখলেছের আমলের একটি দৃষ্টান্ত

পবিত্র কুরআনের নিম্নের দু'টি আয়াতে দান-খয়রাতকারী দুই শ্রেণীর মানুষের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে ঐসব লোক, যারা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদ কল্যাণখাতে ব্যয় করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে ঐসকল মানুষ, যারা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ দ্বারা গরীব, মিসকীন ও অভাবীদের সাহায্য

করে। এ দুই শ্রেণীর মানুষের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডকে দেখতে সম্পূর্ণ একই মনে হয়। মানুষের চোখ এর মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে যে, যেহেতু তাদের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য ভিন্ন, তাই তাদের আমলের ফলাফলও ভিন্ন হবে। এক শ্রেণীর মানুষের আমল বরকত ও কল্যাণে পরিপূর্ণ, আর অপর শ্রেণীর মানুষের আমল সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও বিনষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ط

তোমরা ঐ ব্যক্তির মত নিজেদের দান-খয়রাতকে বিনষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে থাকে, অথচ সে আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন যে, একটি মসৃণ পাথরে কিছু মাটি জমে গেল (এবং এর উপর কিছু সবুজ ঘাস উৎপন্ন হয়ে গেল।) তারপর এর উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হল এবং একে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তাই এই ধরনের রিয়াকার লোকেরা নিজেদের উপার্জিত সম্পদের কোন বিনিময় লাভ করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ এই অকৃতজ্ঞদেরকে হেদায়াত ও এর সুমিষ্ট ফল থেকে বঞ্চিতই রাখবেন। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৪)

অপরদিকে মুখলেছদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج

যারা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজেদের মনকে সুদৃঢ় ও ত্যাগ-তিতীক্ষায় অভ্যস্ত করার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাহে খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে টিলায় অবস্থিত সজীব বাগানের মত, যাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এর ফলে দ্বিগুণ ফল দান করে। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২৬৫)

এখানে যদিও উভয় ব্যক্তি বাহ্যত একইভাবে নিজেদের ধন-সম্পদ গরীব, মিসকীন ও অভাবীদের জন্য ব্যয় করেছে; কিন্তু একজনের নিয়্যত যেহেতু কেবল লোকদেখানোই ছিল, তাই মানুষের সামনে তার এই প্রদর্শনী সাময়িক বাহবা কুড়ানো ছাড়া আর কিছুই লাভ হল না। কেননা, তার এই অর্থব্যয়ের পেছনে এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি যেহেতু এ অর্থ ব্যয় ও ত্যাগ দ্বারা কেবল আল্লাহ্র সন্তোষ ও তাঁর অনুগ্রহ কামনা করেছিল, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার নিয়্যত অনুযায়ী ফল দান করেছেন।

সারকথা, এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র নীতি ও তাঁর বিধান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এ কথাটিরই ঘোষণা দিয়েছেন।

দুনিয়াতে বাহ্যিক অবস্থার উপর সকল ফায়সালা হয়ে থাকে, আখেরাতে নিয়্যতের উপর ফায়সালা হবে

এই জগতে যেখানে আমরা বর্তমানে রয়েছি এবং যেখানে আমাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিয়ে রাখা হয়েছে, এটাকে "আলমে যাহের" তথা দৃশ্য ও প্রকাশ্য জগত বলা হয়। এখানে

আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং সকল বোধ-বুদ্ধির সীমানা ও বাহ্যিক অবস্থা ও বিষয়াবলী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এখানে আমরা কোন ব্যক্তির কোন বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখেই তার ব্যাপারে ভাল অথবা মন্দ কোন মন্তব্য করতে পারি এবং এরই ভিত্তিতে তার সাথে আমরা নিজেরাও আচরণ করে থাকি। বাহ্যিক কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণের বাইরে তাদের নিয়্যত, অন্তরের রহস্য ও মনের গোপন অবস্থা উপলব্ধি করতে আমরা অক্ষম। এই জন্যই ফারুকে আযম হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ আমাদের কাজ হচ্ছে বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করা, আর গোপন অবস্থা আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেওয়া।

কিন্তু আখেরাতের জগতে বিচারক হবেন আল্লাহ্ তা'আলা, যিনি সকল গোপন বিষয় সম্যক অবগত। তাই সেখানে মানুষের নিয়্যত ও মনের ইচ্ছা বিবেচনায় সকল বিচার ও সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। অতএব, মনে রাখতে হবে যে, এই জগতে বিধান প্রয়োগের বেলায় যেমন বাহ্যিক আমল ও কর্মই মূল বিষয় এবং কারো নিয়্যতের উপর এখানে বিচার করা যায় না, অনুরূপভাবে আখেরাতে বিষয়টি হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে বিচার ও ফায়সালা করবেন নিয়্যত দেখে। সেখানে বাহ্যিক আমল ও কর্মকে কেবল নিয়্যতের অনুগামী হিসাবে গণ্য করা হবে।

হাদীসটির বিশেষ গুরুত্ব

এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত তত্ত্বপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত বাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। দ্বীনের একটা বিরাট অংশ এই হাদীস নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। তাই এটাকে 'ক্ষুদ্র ঝিনুকের ভিতরে মহাসমুদ্র' বলা যায়। এই জন্যই কোন কোন ইমাম বলেছেন, ইসলামের এক তৃতীয়াংশ এই হাদীসে এসে গিয়েছে। আর বাস্তবতার নিরিখে বলতে গেলে মহান ইমামদের এই কথায় কোন অতিরঞ্জন নেই; বরং তাদের কথাই যথার্থ। কেননা, মৌলিক দিক থেকে ইসলামের বিভাগ তিনটি ঃ (১) ঈমান তথা আকীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী, (২) আমল ও (৩) এখলাছ। যেহেতু এই হাদীস এখলাছের সম্পূর্ণ বিভাগকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, তাই বলা যায় যে, ইসলামের এক তৃতীয়াংশই এখানে এসে গিয়েছে।

এখলাস এমন বস্তু যে, প্রত্যেক কাজে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে এর প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশেষ করে আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যখন কোন শুভ কাজের সূচনা করে, সে কাজটি আমল সংক্রান্তই হোক অথবা গবেষণাধর্মীই হোক, সেখানে সে প্রয়োজন অনুভব করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীটি চোখের সামনে থাকুক। এই জন্যই অনেক মনীষীকেই দেখা যায় যে, তাঁরা নিজেদের গ্রন্থসমূহ এই হাদীস দ্বারা শুরু করা খুবই পছন্দ করেছেন। যেমন, ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর অমরগ্রন্থ বুখারী শরীফকে এই হাদীস দ্বারাই শুরু করেছেন। তাঁর পরে ইমাম বগভী (রহঃ) তাঁর মাসাবীহ নামক হাদীসগ্রন্থকেও এই হাদীস দ্বারা শুরু করেছেন। তাঁরা যেন এই হাদীসটিকে কিতাবের 'প্রারম্ভিকা' বানিয়ে নিয়েছেন। হাফেযুল হাদীস আব্দুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী (রহঃ) বলেন, কেউ কোন দ্বীনি কিতাব লিখতে চাইলে এই হাদীস দ্বারাই সেই কিতাবের সূচনা হোক, এটাই আমি উত্তম মনে করি। আমি নিজে কোন কিতাব লিখলে এর প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনা এই হাদীস দ্বারাই করব। —ফতহুল বারী

অধম লিখক নিবেদন করছে যে, এই জন্যই আমি আমার সংকলনটিও এই হাদীস দ্বারাই শুরু করলাম। আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দরভাবে তা সমাপ্ত করার তওফীক দান করুন এবং কবূল করে নিন। এর সাথে আমাকে এবং কিতাবের সকল পাঠককে পরিপূর্ণ এখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়্যত নসীব করুন। আমীন

(এখন থেকে এক বিশেষ তরতীব ও বিন্যাসে এখানে ঐসব হাদীস লিপিবদ্ধ করা হবে, যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান ও ইসলামের অথবা এগুলোর ভিত্তি ও শাখা-প্রশাখাসমূহের অথবা ঈমান ও ইসলামের অপরিহার্য পরিপূরক বিষয়সমূহের অথবা এগুলোর কল্যাণ ও ফলশ্রুতির অথবা এগুলোর ক্ষতিকারক ও সাংঘর্ষিক বিষয়সমূহের আলোচনা করেছেন। এই পর্যায়ে সর্বপ্রথম হাদীসে জিবরাঈল লিখা হচ্ছে যার মধ্যে মৌলিকভাবে দ্বীনের সকল বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এই কারণেই হাদীসটি উম্মুস্ সুন্নাহ তথা হাদীসের মূল নামে পরিচিত।)

ইসলাম, ঈমান ও এহ্সানের পরিচয়

(٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِسْلاَمُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً، قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرٰى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرَئِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - (رواه مسلم)

২। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। (এই হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ঐ সময় পবিত্র মজলিসে অনেক সাহাবায়ে কেরাম সমবেত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন।) এমন সময় হঠাৎ এক

ব্যক্তি সামনে আসল, যার পোশাক ছিল খুবই শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন আর চুলগুলোও ছিল ঘন কালো। তার মধ্যে সফরের কোন লক্ষণ বুঝা যাচ্ছিল না, (যাতে মনে হচ্ছিল যে, এ ব্যক্তি বহিরাগত কেউ নয়।) কিন্তু এরই সাথে আরেকটি ব্যাপার ইহাও ছিল যে, আমাদের কেউই তাকে চিনতে পারছিল না, (যাতে ধারণা হচ্ছিল যে, এ কোন বহিরাগত লোকই হবে, এরই মধ্যে লোকটি উপস্থিত জনতার বৃত্তকে অতিক্রম করে সামনে আসল।) এভাবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে নিজের হাঁটুদ্বয়কে তাঁর হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে বসে গেল এবং নিজের হাত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রানের উপর রেখে দিল। তারপর বলল, হে মুহাম্মদ! আমাকে বলুন, ইসলাম কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ ইসলাম হল, (অর্থাৎ, ইসলামের মূল ভিত্তি হল,) তুমি (মুখে ও অন্তরে) এই কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ (অর্থাৎ, বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত কোন সত্তা) নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল, আর নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করবে। নবাগত লোকটি এই উত্তর শুনে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ওমর (রাঃ) বলেন, আমাদের আশ্চর্য লাগল যে, লোকটি প্রশ্নও করে আবার নিজেই সত্যায়ন করে। তারপর সে আরয করল, এখন আমাকে বলুন, ঈমান কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর নবী-রাসূলদের প্রতি, শেষ দিবস অর্থাৎ কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, (অর্থাৎ, এগুলোকে সত্য বলে জানবে ও মানবে।) আর প্রত্যেক ভাল-মন্দ বিষয়কে তকদীরের লিখন বলে মেনে নেবে। (এই উত্তর শুনেও) আগন্তুক লোকটি বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি আবার বলল, এহসান কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এহসান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর এবাদত ও বন্দেগী এভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। তারপর লোকটি আবার বলল, আমাকে কেয়ামত সম্পর্কে বলুন (যে, এটা কবে হবে) তিনি উত্তরে বললেন ঃ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী জানে না। তারপর ঐ আগন্তুক বলল, তাহলে আমাকে এর কিছু লক্ষণাদিই বলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তরে বললেন ঃ (এর একটি লক্ষণ এই যে,) দাসী তার কর্তী ও মনিবকে জন্ম দেবে। (আর দ্বিতীয় লক্ষণটি এই যে,) তুমি দেখবে যে, যাদের পায়ে জুতা ও গায়ে কাপড় নেই এবং যারা নিঃস্ব ও ছাগল চরিয়ে খায়, তারাই বিরাট বিরাট অট্টালিকা তৈরী করবে এবং তা নিয়ে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এসব কথাবার্তা বলে আগন্তুক লোকটি চলে গেল। এভাবে বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে ওমর! তুমি বলতে পার, প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিল ? আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন ঃ ইনি ছিলেন জিব্রাঈল। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এই মজলিসে এসেছিলেন। ---মুসলিম

বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে একজন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন ঃ (১) ইসলাম, (২) ঈমান, (৩) এহসান, (৪) কেয়ামতের ব্যাপারে এই তথ্য যে, এটা সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ

জানেন না এবং (৫) কেয়ামতের পূর্বে প্রকাশিত এর কিছু লক্ষণ ও আলামত। এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে যা কিছু এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এর সবগুলোই ব্যাখ্যার দাবী রাখে। তাই প্রথমেই আসা যাক ইসলাম প্রসঙ্গে।

(১) ইসলাম ঃ ইসলামের আসল অর্থ হচ্ছে নিজেকে কারো কাছে সমর্পণ করে দেওয়া এবং সম্পূর্ণ তারই নির্দেশের অধীন হয়ে যাওয়া। আর মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত ও তাঁর রাসূলগণ কর্তৃক আনীত দ্বীনের নাম 'ইসলাম' এজন্যই রাখা হয়েছে যে, এখানে বান্দা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে দেয় এবং তাঁর সার্বিক আনুগত্যকে নিজের জীবন সাধনার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নেয়। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে ইসলামের হাকীকত ও তাৎপর্য এবং আমাদের কাছে এরই দাবী করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের আল্লাহ্ তো একক আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা মুসলিম অর্থাৎ তাঁরই আজ্ঞাধীন হয়ে যাও। (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ৩৪)

এই ইসলাম সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ তার চেয়ে উত্তম মানুষ আর কে হতে পারে, যে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে এবং সে এভাবে মুসলিম বান্দা হয়ে গিয়েছে। (সূরা নিসা ঃ আয়াত ১২৫)

এই ইসলাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অবলম্বন করতে চায়, তার পক্ষ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে আখেরাতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৮৫)

মোটকথা, ইসলামের মূল প্রাণশক্তি ও এর হাকীকত এটাই যে, বান্দা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে দেবে এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁরই আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে।

নবী-রাসূলদের আনীত শরীঅতসমূহে এই ইসলামের জন্য বিশেষ কিছু মৌলিক বিধি-বিধানও থাকে, যেগুলোর অবস্থান এই মূল ইসলামের অবয়ব তুল্য। আর এই মূলের ক্রমবৃদ্ধি ও এর সজীবতা এ সকল বিধি-বিধানের দ্বারাই হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলি সম্পূর্ণ অনুসৃত বিষয় হয়ে থাকে এবং এই বিষয়গুলো দ্বারাই বাহ্যত তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, যারা ইসলামকে নিজেদের জীবনবিধান বানিয়ে নিয়েছে আর যারা তা করেনি।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ইসলামের যে সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ জীবনবিধান আমাদের কাছে এসেছে, এর মধ্যে আল্লাহ্‌র একত্বতার বিশ্বাস, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান, নামায, যাকাত, রোযা ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জকে ইসলামের স্তম্ভ ও মৌলিক বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্য এক হাদীসেও বলা হয়েছে ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর স্থাপিত।

যা হোক, ইসলামের পরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে এই হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাঁচটি জিনিসকে উল্লেখ করেছেন, এগুলোই হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদ। আর এগুলোই মূল ইসলামের দৃষ্ট অবয়ব। এই জন্যই ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে এই বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) ঈমান ঃ ঈমানের আসল অর্থ হচ্ছে কারো নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে তার কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। দ্বীনের বিশেষ পরিভাষায় ঈমানের মূলতত্ত্ব হচ্ছে এই যে, আল্লাহর রাসূল আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বোধশক্তির ঊর্ধ্বের যেসকল বিষয়ের কথা বলেন এবং

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁরা যে হেদায়াত ও জ্ঞান নিয়ে আসেন, সেগুলোকে সত্য ও বাস্তব মনে করে বিশ্বাস করে নেওয়া এবং মেনে নেওয়া। যা হোক, পারিভাষিক ঈমানের সম্পর্ক মূলতঃ অদৃশ্য বিষয়াবলীর সাথেই থাকে, যেগুলো আমরা নিজেদের অনুভূতিযন্ত্র ও বোধশক্তি যেমন নাক, কান ইত্যাদি দ্বারা বুঝতে পারি না। যেমন, মহান আল্লাহ্, তাঁর গুণাবলী, তাঁর বিধি-বিধান, নবী-রাসূলদের রেসালত এবং তাঁদের প্রতি ওহী অবতরণ, সৃষ্টির সূচনা ও পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের বর্ণনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের যে সকল বিষয় আল্লাহ্‌র রাসূল বর্ণনা করেন এগুলোকে তাঁর বিশ্বস্ততার ভরসায় সত্য মনে করে মেনে নেওয়ার নামই শরীঅতের পরিভাষায় ঈমান। আর রাসূলের বর্ণিত এ ধরনের যে কোন বিষয়কে অস্বীকার করা অথবা তাকে সত্য বলে বিশ্বাস না করাই হচ্ছে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, যা মানুষকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দিয়ে কুফরের সীমানায় পৌঁছে দেয়। তাই একজন মানুষের মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল কর্তৃক আনীত সকল বিষয় ও তথ্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া জরুরী। তবে এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা জরুরী নয়; বরং মূল ঈমানের জন্য সংক্ষিপ্ত ও সার বিশ্বাসই যথেষ্ট।

তবে কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় এমনও রয়েছে যে, ঈমানের সীমানায় প্রবেশ করার জন্য এগুলোর প্রতি নিরুপণসহ বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী। যেমন, আলোচ্য হাদীসে ঈমান প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, (অর্থাৎ, আল্লাহ্, ফেরেশতা, আল্লাহ্‌র কিতাব, আল্লাহ্‌র রাসূল, কেয়ামত ও তকদীরের ভাল-মন্দ) ঈমান সংক্রান্ত বিষয়সমূহের মধ্যে এগুলোই হচ্ছে মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়। আর এগুলোর উপর নির্দিষ্টভাবে ও নিরুপণ করে ঈমান পোষণ করা জরুরী। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে এবং নির্দিষ্ট করে এগুলোর উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনেও ঈমান সংক্রান্ত এই বিষয়গুলি এই ক্রমধারায় ও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারার শেষ রুকূতে এরশাদ হয়েছে ঃ রাসূল ঈমান রাখেন ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সকল মু'মিনগণও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি। সূরা নিসায় এরশাদ হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।

উপরে উল্লেখিত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে 'তকদীরের প্রতি ঈমান' প্রসঙ্গটি যদিও কুরআনে অন্যান্য ঈমানী বিষয়সমূহের সাথে একই সঙ্গে আলোচিত হয়নি; কিন্তু পবিত্র কুরআনেই অন্যান্য স্থানে এর সুষ্ঠু উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, সূরা নিসায় এরশাদ হয়েছে ঃ "হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, সব কিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং তাঁরই নির্দেশে হয়। সূরা আন'আমে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তিনি তার বক্ষ উন্মোচন করে দেন। আর যাকে গোমরাহ রাখার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন।"

এবার সংক্ষেপে জেনে নিতে হবে যে, এ বিষয়গুলোর উপর ঈমান আনার অর্থ কি ? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনি বর্তমান, তিনি একক ও

শরীকবিহীন, তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি সকল দোষ ও দুর্বলতার ঊর্ধ্বে এবং তিনিই সকল গুণের আধার।

ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, সৃষ্টিজগতের মধ্যে তাঁদেরকে একটি বিশেষ শ্রেণী হিসাবে তাঁদের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, তাঁরা এক পবিত্র ও সম্মানিত সৃষ্টি। কুরআন পাকে সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ "তারা হচ্ছে সম্মানিত বান্দা।" এই ফেরেশতাদের মধ্যে কোন মন্দ দিক, কোন প্রকার দুষ্টামি ও অবাধ্যতার উপাদানই নেই; বরং তাদের কাজই হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও নির্দেশ পালন। সূরা তাহ্‌রীমে এরশাদ হয়েছে ঃ "তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের অবাধ্যতা করে না; বরং তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যায়।" তাদের দায়িত্বে অনেক কাজ ও দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, যেগুলো তারা সুন্দরভাবে সম্পাদন করে থাকে।

ফেরেশ্‌তাদের ব্যাপারে একটি সংশয় ও এর উত্তর

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই সংশয় উত্থাপন করা হয় যে, তাঁরা বর্তমান থাকলে তো আমরা অবশ্যই দেখতে পেতাম, এটা অত্যন্ত মূর্খতাপ্রসূত সংশয়। কেননা, দুনিয়াতে এমন অনেক বস্তু রয়েছে, যেগুলো বর্তমান ও অস্তিত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই না। বর্তমান যুগের অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে কি কেউ পানিতে, বাতাসে এবং রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে ঐসব জীবাণু দেখেছিল, যেগুলো আজ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সবাই দেখতে পারে ? আমরা কি কোন যন্ত্রের সাহায্যেও নিজেদের আত্মাকে দেখতে পাই ? তাই যেমনভাবে আমাদের চোখ আমাদের আত্মাকে দেখতে অপারগ এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া পানি ইত্যাদির মধ্যে লুক্কায়িত রোগ-জীবানু দেখতে অক্ষম, ঠিক সেভাবেই এগুলো ফেরেশতাকুলকে দেখতেও অপারগ। তারপর একথার কি প্রমাণ আছে যে, আমরা চোখে যে জিনিস দেখি না, সেটার অস্তিত্বই নেই ? আমাদের চোখ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি কি অস্তিত্বজগতের সব কিছুকে ধারণ করতে পারে ? এসব কথা— বিশেষ করে যখন নব নব আবিষ্কারের দ্বার উন্মোচিত হতে চলেছে— কেবল চরম নির্বোধ ব্যক্তিই বলতে পারে।

আসলে মানুষের জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের উপকরণ ও উপাদানসমূহ খুবই দুর্বল ও সীমিত। এ কথাটিই কুরআন পাকে এভাবে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদেরকে কেবল সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার অর্থ এই যে, একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য বিভিন্ন সময়ে পথ নির্দেশিকা তথা আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ও সমাপক গ্রন্থ হচ্ছে কুরআন শরীফ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী ও সারনির্যাসও। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এমন সেসব বিষয় ছিল, যেগুলোর শিক্ষা ও প্রচারের প্রয়োজন সর্বকালেই থাকবে, সেসব বিষয়সমূহ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত রয়েছে। তাই বলা যায় যে, এই কুরআন সকল আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে পরিবেষ্টন করে সকল কিতাবের প্রয়োজন থেকে মানবজাতিকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ যেহেতু বর্তমানে সংরক্ষিত নয়; তাই এটাই একমাত্র সুপথের দিশারী মহাগ্রন্থ। এই কিতাবই সব কিতাবের স্থলাভিষিক্ত এবং সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত এটা

সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "কুরআন আমিই নাযিল করেছি, আর আমিই এর সংরক্ষণকারী।" (সূরা হিজর)

আল্লাহ্র রাসূলদের উপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, এই বাস্তব সত্যকে বিশ্বাস করে নেওয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর নির্বাচিত বান্দাদেরকে হেদায়াত ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নীতিমালা দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্র পয়গাম বান্দাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা মানবজাতিকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করে গিয়েছেন। এ সকল নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র নির্বাচিত প্রিয়জন ও সত্যের প্রতীক ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে কিছু কিছু নবী-রাসূলের নাম ও তাঁদের কিছু অবস্থাও কুরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "আমি আপনার পূর্বে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি। তাদের কারো কারো অবস্থা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো অবস্থা বিবৃত করিনি।" (সূরা মু'মিন)

আল্লাহ্ তা'আলার এইসব নবী-রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া এবং নবী হিসাবে তাদের সম্মান ও ভক্তি করা ঈমানের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে সাথে এ বিষয়ের উপরও ঈমান আনা জরুরী যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই নবুওয়াত ও রেসালতের ক্রমধারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পরিসমাপ্ত করে দিয়েছেন। তাই তিনিই খাতামুল আম্বিয়া ও আল্লাহ্র শেষ রাসূল। তাঁর যুগ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানব সমাজের মুক্তি ও সফলতা কেবল তাঁরই আনুগত্য ও তাঁরই আনীত হেদায়াতের অনুসরণের মধ্যে নিহিত।

আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে এই বাস্তব ও সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া যে, এই দুনিয়াকে একদিন অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরতে সকল মৃত প্রাণীকে পুনরায় জীবন দান করবেন এবং এখানে যে যেমন কর্ম করেছে, সে অনুযায়ী তাদেরকে সেখানে শান্তি অথবা শান্তি দেওয়া হবে।

জানা আবশ্যক যে, দ্বীন-ধর্মের সকল কর্মকান্ডের ভিত্তি এই বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত যে, আখেরাতে মানুষের বিচার তথা শান্তি অথবা শান্তি হবে। মানুষ যদি এই বিষয়টি স্বীকার না করে, তাহলে সে কোন ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং এর পথনির্দেশনা মানতে ও এগুলো পালন করতেই রাঁজী হবে না। এই জন্যই সকল ধর্মে— তা মানুষের মনগড়া ধর্মই হোক অথবা আল্লাহ্র প্রেরিত দ্বীন হোক— এই শান্তি ও পুরস্কারকে মৌলিক বিশ্বাস হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তারপর মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত ধর্মগুলোতে এর স্বরূপ "পুনঃ জন্মবাদ" বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্প্রদত্ত সকল ধর্মই এই বিষয়ে একমত যে, আখেরাতের শান্তি ও শান্তির পদ্ধতি ঐ পুনরুত্থান ও হাশর-নশরই, যা কুরআন আমাদেরকে বলে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে এমন প্রামাণিক ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, চরম পর্যায়ের আহ্মক ও নির্বোধ ছাড়া অন্য কেউ কুরআনের এসব অকাট্য ও যুক্তিযুক্ত আলোচনার পর হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের বিষয়টিকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করতে পারে না।

তকদীরের প্রতি ঈমান এর অর্থ হচ্ছে এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও স্বীকার করে নেওয়া যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে (তা ভালই হোক আর মন্দই হোক,) এ সবই আল্লাহ্র নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছায়ই হচ্ছে। এগুলোর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা তিনি পূর্বেই করে রেখেছেন। এমন নয় যে, তিনি অন্য একটা কিছু চান, আর পৃথিবীর এই কারখানা তাঁর ইচ্ছার বিপরীত

চলছে। এমন মনে করলে আল্লাহ্ তা'আলার চরম অপারগতা ও অক্ষমতা মেনে নিতে হয়, যা ঈমানের পরিপন্থী।

(৩) এহ্সান ঃ ইসলাম ও ঈমানের পর প্রশ্নকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তৃতীয় প্রশ্নটি করেছিল এহ্সান সম্পর্কে যে, এহ্সানের প্রকৃত অর্থ কি ?

এই 'এহ্সান' শব্দটিও ঈমান ও ইসলামের মত একটি বিশেষ ধর্মীয় পরিভাষা। বিশেষতঃ এটা কুরআনের পরিভাষা। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে এবং এর সাথে তার মধ্যে 'এহ্সান' গুণও রয়েছে, তার প্রতিপালকের কাছে তার জন্য রয়েছে বিশেষ প্রতিদান।" (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১১২)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ "তার চাইতে উত্তম দ্বীনদার আর কে আছে, যে নিজেকে আল্লাহ্তে সমর্পণ করে দিয়েছে এবং সাথে সাথে তার মধ্যে এহ্সানের গুণও বিদ্যমান।" (সূরা নিসা)

আমাদের ভাষায় ও বাকপদ্ধতিতে তো এহ্সান শব্দের অর্থ কারো সাথে উত্তম ও অনুগ্রহমূলক আচরণ করা, কিন্তু এখানে যে এহ্সানের কথা বলা হচ্ছে সেটা ভিন্নতর এক পরিভাষা। আর এর মর্মও তাই, যা আলোচ্য হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্র বন্দেগী এভাবে করা, যেন মহান প্রতাপশালী ও পবিত্র সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের চোখের সামনেই রয়েছেন এবং আমরাও যেন তাঁকে দেখছি।

এ বিষয়টি এভাবে বুঝে নিতে পারেন যে, একজন গোলাম তার মনিবের হুকুম পালন তখনও করে, যখন মনিব তার চোখের সামনে উপস্থিত থাকে এবং গোলামও বিশ্বাস করে যে, তিনি আমাকে ভালভাবেই দেখছেন। আর তার হুকুম পালনের আরেকটি ধরন তখন হয়, যখন সে মনিবের অনুপস্থিতিতে কাজ করে। এই দুই সময়ের কাজে সাধারণতঃ পার্থক্য হয়ে থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মালিকের উপস্থিতিতে গোলাম যেরূপ মনোযোগ ও পরিশ্রমের সাথে সুন্দরভাবে কার্য সম্পাদন করে, মালিকের অনুপস্থিতিতে তার অবস্থা সেরূপ থাকে না। ঠিক একই অবস্থা হয়ে থাকে প্রকৃত মনিব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে তাঁর বান্দাদের। বান্দা যখন অনুভব করে যে, আমার মাওলা ও মনিব হাযির-নাযির অর্থাৎ তিনি আমার সামনেই রয়েছেন এবং আমাকে দেখছেন, আমার প্রতিটি কাজ— বরং আমার প্রতিটি গতি ও বিরাম তিনি দেখছেন, তখন তার মধ্যে এক বিশেষ মত্ততা ও তাঁর বন্দেগীতে বিশেষ ধরনের বিনয়ভাব ফুটে উঠে। কিন্তু তার অন্তরে যখন এ কল্পনা ও এ অনুভূতি উপস্থিত থাকে না, তখন তার বন্দেগীর ঐ অবস্থাও আর অবশিষ্ট থাকে না।

তাই এহ্সান এটাই যে, আল্লাহ্র বন্দেগী এভাবে করা হবে যে, তিনি যেন আমাদের চোখের সামনেই রয়েছেন, আর আমরাও তাঁর সামনে উপস্থিত এবং তিনি আমাদেরকে দেখছেন। হাদীসে উল্লেখিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তির মর্ম এটাই, যেখানে তিনি বলেছেন, এহ্সান এরই নাম যে, তুমি আল্লাহ্র বন্দেগী এভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। কেননা, তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়

অনেকে হাদীসের এই অংশটির ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, মনে হয়, এর সম্পর্ক কেবল নামাযের সাথেই এবং এর অর্থ কেবল এই যে, নামায খুব মনোযোগ সহকারে একাগ্রতার সাথে আদায় করতে হবে। কিন্তু হাদীসের শব্দমালার এমন বিশেষত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়

না। হাদীসে 'আল্লাহ্‌র এবাদত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কেবল নামাযের সাথে এটাকে সংশ্লিষ্ট রাখার কোন কারণ নেই; বরং যে কোন এবাদতই এর অন্তর্ভুক্ত; বরং এই হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনায় 'আল্লাহ্‌কে ভয় করবে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এহ্‌সান হচ্ছে আল্লাহ্‌কে এভাবে ভয় করা, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। এই ঘটনারই অন্য আরেক বর্ণনায় এরূপ শব্দমালাও এসেছে, যার অর্থ এই ঃ এহ্‌সান হচ্ছে এই যে, তুমি সকল কাজ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এভাবে সম্পাদন করবে যে, তুমি যেন তাঁকে দেখছ। এই দু'টি বর্ণনার দ্বারা এ কথা আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এহ্‌সানের সম্পর্ক কেবল নামাযের সাথেই নয়; বরং মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের সাথে এটা জড়িত। তাই এহ্‌সানের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌র সকল এবাদত এবং তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালন এভাবে করতে হবে এবং তাঁর শাস্তিকে এভাবে ভয় করতে হবে যে, তিনি যেন আমাদের সামনেই রয়েছেন এবং আমাদের সকল কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছেন।

(৪) কেয়ামত ঃ ইসলাম, ঈমান ও এহ্‌সান সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর আগন্তুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যে, আমাকে বলে দিন, কেয়ামত কবে হবে। উত্তরে তিনি বললেন, এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক অবগত নয়। অর্থাৎ, কেয়ামত আসার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে প্রশ্নকারীর যেমন জানা নাই, আমারও জানা নেই। এই হাদীসেরই আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এখানে এ শব্দমালাও এসেছে ঃ

فِيْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ- اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ط

অর্থ ঃ কেয়ামতের বিষয়টি ঐ পাঁচ জিনিসের অন্তর্গত, যেগুলো আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। (যেমন, এই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ) নিশ্চয়, কেয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনিই তা জানেন। কেউ জানে না, আগমীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না, কোন্ জায়গায় সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীকে প্রথমে বলে দিলেন যে, কেয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চাইতে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি বেশী অবগত নয়। তারপর অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে একথাও বলে দিলেন যে, কেয়ামতের বিষয়টি ঐ পাঁচ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এগুলোর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ এগুলো জানেন না।

হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ বলেন, কেয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "এ বিষয়ে আমি জানি না" না বলে "প্রশ্নকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না" এই বর্ণনাভঙ্গী এজন্য অবলম্বন করেছেন, যাতে মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, কোন প্রশ্নকারী ও কোন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরই এই ব্যাপারে জ্ঞান নেই। তারপর কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে তিনি বিষয়টি আরো পাকাপোক্ত করে দিলেন।

(৫) কেয়ামতের আলামত ঃ কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে উপরোক্ত উত্তর শুনে প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিবেদন করে বলল ঃ আমাকে কেয়ামতের কিছু নিদর্শনই বলে দিন। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি বিশেষ নিদর্শন বর্ণনা করলেন। একটি নিদর্শন এই যে, দাসী তার মালিক ও মনিবকে জন্ম দেবে, আর দ্বিতীয়টি এই যে, নিঃস্ব ও ভুখা-নাঙ্গা মানুষ— যাদের কাজ হচ্ছে ছাগল চরানো— তারাও বিরাট বিরাট অট্টালিকা তৈরী করবে।

প্রথম যে নিদর্শনটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ এর বিভিন্ন মর্ম উল্লেখ করেছেন। তবে এই অধম সংকলকের কাছে এর সব চাইতে সুন্দর ব্যাখ্যা এই যে, কেয়ামত সন্নিকটে আসার সময় পিতা-মাতার অবাধ্যতা ব্যাপক রূপ ধারণ করবে। এমনকি কন্যাসন্তান যাদের প্রকৃতি ও স্বভাবে মায়েদের আনুগত্য ও হৃদ্যতার উপাদান খুবই প্রবল থাকে এবং যাদের ব্যাপারে মায়েদের অবাধ্যতার কল্পনাও করা যায় না— তারাও কেবল মায়েদের অবাধ্যই হবে না; বরং উল্টো তাদের উপর এভাবে শাসন চালাবে, যেভাবে গৃহকর্তা ও মনিব তার ক্রীতদাসীর উপর শাসন চালায়। এ কথাটিই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বর্ণনাভঙ্গীতে বলেছেন যে, "মহিলা তার মালিক ও মনিবকে জন্ম দেবে।" অর্থাৎ, মায়ের গর্ভ থেকে যে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে-ই বড় হয়ে এই মায়ের উপর শাসন চালাবে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই নিদর্শন প্রকাশের সূচনা হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় যে নিদর্শনটির কথা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে, "ভূখা-নাঙ্গা ও রাখাল শ্রেণীর মানুষ সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করবে।" এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত এগিয়ে আসলে দুনিয়ার সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি ঐসব নিম্নশ্রেণীর মানুষের হাতে এসে যাবে, যারা আসলে এর যোগ্য নয়। তখন তারা কেবল সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণের নেশায় পড়ে থাকবে এবং এটাকেই তারা গৌরব ও বাহাদুরীর বিষয় মনে করবে। এতেই তারা নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মনের সাধ পূরণ করবে এবং এক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে।

অন্য এক হাদীসে এ বিষয়টিকে এই শব্দমালায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, বিভিন্ন পদ ও কর্মকাণ্ড অযোগ্য লোকদের হাতে ন্যস্ত হবে, তখন তুমি কেয়ামতের অপেক্ষায় থাক।

আলোচ্য হাদীসের শেষে রয়েছে যে, এই প্রশ্নকারী চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই প্রশ্নকারী ছিলেন জিবরাঈল। তিনি প্রশ্নকারীর রূপ ধরে এ জন্য এসেছিলেন, যাতে এ প্রশ্নোত্তর দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

এ হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় এ কথার উল্লেখও আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর এই আগমন ও কথোপকথনের ঘটনাটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিকে হয়েছিল। —ফতহুল বারী ও উমদাতুল কারী

এর রহস্য এই যে, তেইশ বছরের নবুওতী জিন্দেগীতে যে দ্বীনের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয়েছিল; আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় এটা চাইলেন যে, জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান দ্বারা পূর্ণ দ্বীনের সারবস্তু বয়ান করিয়ে দিয়ে

সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হোক এবং তাদেরকে এই দ্বীনের আমানতের সংরক্ষণকারী বানিয়ে দেওয়া হোক।

বাস্তব কথা এই যে, দ্বীনের মূল বিষয় তিনটিই ঃ (১) বান্দা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অনুগত ও হুকুমবরদার বানিয়ে নেবে এবং তাঁর বন্দেগীকেই নিজের জিন্দেগী বানিয়ে নেবে। আর এরই নাম হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামের মূল বিধানগুলো হচ্ছে এর দৃষ্ট অবয়ব ও প্রকাশস্থল। (২) ঐ সকল অদৃশ্য বাস্তব বিষয়সমূহকে মেনে নেওয়া এবং এগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ যেগুলোর সংবাদ দিয়েছেন এবং এগুলো স্বীকার করার প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। আর এরই নাম ঈমান। (৩) আল্লাহ্ যদি ভাগ্যে রাখেন তাহলে ইসলাম ও ঈমানের স্তরসমূহ অতিক্রম করার পর তৃতীয় ও চূড়ান্ত মনযিল এই আসে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার উপস্থিতি ও অন্তরে আল্লাহ্‌র ধ্যানের এমন মত্ততা অনুভব করে যে, তখন তাঁর নির্দেশ পালন ও বন্দেগী এমনভাবে হতে থাকে, যেন আল্লাহ্ তাঁর সকল শোভা ও প্রতাপসহ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে দেখছেন। এ অনুভূতি ও এ অবস্থার নামই হচ্ছে 'এহ্‌সান'।

এভাবে এই প্রশ্নোত্তরে যেন সম্পূর্ণ দ্বীনের সারবস্তু এসে গিয়েছে। এই কারণেই এ হাদীসকে ওলামায়ে কেরাম 'উম্মুস্‌সুন্নাহ' নামেও অভিহিত করেছেন। কোরআন পাকের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে সূরা ফাতেহায় অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে যেমন এ সূরাকে 'উম্মুল কিতাব' বলা হয়, তেমনিভাবে এই হাদীসটি ব্যাপক বিষয়ের আলোচনায় সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে 'উম্মুস্ সুন্নাহ' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ সহীহ মুসলিমকে— ভূমিকার পর— এই হাদীস দ্বারাই শুরু করেছেন। ইমাম বগভী (রহঃ) ও তাঁর উভয় সংকলন "মাছাবীহ্" এবং "শরহুস সুন্নাহ্" এর শুরুতে এ হাদীসটিই এনেছেন।

এ হাদীসটি এখানে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এটা মুসলিম শরীফের বর্ণনা। মুসলিম শরীফ এবং বুখারী শরীফ উভয় কিতাবে ঘটনাটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের অন্যান্য কিতাবে আরো কতিপয় সাহাবী থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলামের ভিত্তিমূল

(٣) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ – (رواه البخارى و مسلم)

৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) হজ্জ পালন করা। (৫) রমযানের রোযা রাখা। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপকভাষায় ইসলামকে এমন একটি ইমারতের সাথে তুলনা করেছেন, যা কয়েকটি স্তম্ভের উপর দাঁড়ানো থাকে। তিনি এখানে বলে দিয়েছেন যে, ইসলামের এই ইমারত ও সৌধও এ পাঁচটি জিনিসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন মুসলমানের জন্য এ অবকাশ নেই যে, সে এইসব বিধি-বিধান পালনে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করবে। কেননা, এগুলো হচ্ছে ইসলামের মূল খুঁটি।

মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ এ পাঁচটি বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর বাইরেও অনেক জরুরী বিধি-বিধান রয়েছে, যেমন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ইত্যাদি। কিন্তু এ পাঁচটি বিষয়ের যে গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এ বৈশিষ্ট্য যেহেতু অন্য বিধানাবলীতে নেই, তাই ইসলামের ভিত্তিমূল কেবল এ পাঁচটি জিনিসকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর ঐ সকল বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব উহাই, যা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে 'হাদীসে জিবরাঈল' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখা হয়েছে। যার সারবস্তু এই যে, এই পঞ্চ রোকন ইসলামের জন্য দৃষ্ট অবয়বের মত। তাছাড়া এগুলোই আল্লাহ্‌র দাসত্বসুলভ এমন বিষয়, যা সত্তাগতভাবে কাম্য ও উদ্দেশ্য এবং এগুলোর অপরিহার্যতা কোন সাময়িক বিষয় ও কোন বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং এগুলো হচ্ছে মৌলিক ও স্থায়ী বিধি-বিধান। পক্ষান্তরে জেহাদ ও সৎ কাজের আদেশের বিষয়টি এমন নয়। কেননা, সেটা বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ পরিস্থিতিতে ফরয হয়ে থাকে।

ইসলামের বিধি-বিধান পালনের উপর জান্নাতের সুসংবাদ

(٤) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ نَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَّجِيْءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْئَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا اِنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ وَ جَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَبِالَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ اللّٰهُ اَرْسَلَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ، قَالَ فَبِا لَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنْ عَلَيْنَا زَكٰوةً فِيْ اَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِا لَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِا لَّذِيْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ، قَالَ ثُمَّ وَلّٰى وَقَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ – (رواه البخارى و مسلم)

৪। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া) কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের তখন এ বিষয়টি খুব ভাল লাগত যে, গ্রামাঞ্চল থেকে কোন বুদ্ধিমান বেদুঈন এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দ্বীনী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুক, আর আমরা তা শুনে উপকৃত হই। এমন অবস্থায় একদিন এক বেদুঈন ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে হাজির হল এবং নিবেদন করল ঃ হে মুহাম্মদ! আপনার এক প্রতিনিধি আমাদের কাছে এসে বলল, আপনি নাকি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ সে তোমাদের কাছে ঠিকই বলেছে। তারপর ঐ বেদুঈন জিজ্ঞাসা করল, আপনি বলুন তো, আসমান কে সৃষ্টি করেছে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ্। তারপর সে আবার প্রশ্ন করল, ভূমি কে সৃষ্টি করেছে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ্। বেদুঈন আবার প্রশ্ন করল, ভূমিতে এই পর্বতমালা কে স্থাপন করেছে এবং এর মধ্যস্থিত জিনিসসমূহ কে তৈরী করেছে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্। এবার বেদুঈন লোকটি বলে উঠল, ঐ মহান সত্তার শপথ, যিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং ভূমিতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, সেই আল্লাহ্ই কি আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই আমাকে প্রেরণ করেছেন। তারপর বেদুঈন আবার বলতে শুরু করল ঃ আপনার প্রতিনিধি আমাদের কাছে এই কথাও বলেছে যে, আমাদের উপর নাকি দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটাও সে ঠিকই বলেছে। বেদুঈন বলল, শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্ই কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, এটা আল্লাহ্রই নির্দেশ। বেদুঈন আবার বলল, আপনার প্রতিনিধি বলেছে যে, আমাদের সম্পদে নাকি যাকাত ধার্য করা হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ এটাও সে ঠিক বলেছে। বেদুঈন বলল, শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্ই কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এটা আল্লাহ্রই নির্দেশ। তারপর ঐ বেদুঈন আবার বলল, আপনার প্রেরিত প্রতিনিধি বলেছে যে, বছরে রমযান মাসের রোযাও নাকি আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এটাও সে ঠিকই বলেছে। বেদুঈন বলল, যে সত্তা আপনাকে প্রেরণ করেছেন, তার শপথ! আল্লাহ্ই কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এটাও আল্লাহ্রই নির্দেশ। বেদুঈন আবার বলল, আপনার প্রতিনিধি আমাদেরকে এ কথাও বলেছে যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তার উপর বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করাও নাকি ফরয ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, সে এটাও ঠিক বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন যে, এই প্রশ্নোত্তর শেষে বেদুঈন চলে গেল এবং যাওয়ার সময় সে বলছিল, ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এগুলোর মধ্যে কিছু বাড়িয়েও নেব না এবং কমও করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে যদি সত্যই বলে থাকে, তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শুরু অংশে প্রশ্ন করার যে নিষেধাজ্ঞার কথাটি বলা হয়েছে, এর দ্বারা কোরআন পাকের ঐ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে ঃ হে মুমিনগণ!

তোমরা এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করো না, যা পরিব্যক্ত হলে তোমাদের কাছেই খারাপ লাগবে। (সূরা মায়েদাহ)

বাস্তব কথাও হচ্ছে এই যে, নতুন নতুন প্রশ্ন করা মানুষের একটি স্বভাব। কিন্তু এ অভ্যাসকে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ছেড়ে দিলে এই ফল হয় যে, মানুষের মন ও আকর্ষণ তখন চুলচেরা তর্ক-বিতর্কের দিকেই বেশী অগ্রসর হয়। আর এতে কথার বিশ্লেষণের প্রবণতাই বেশী সৃষ্টি হয় এবং এ তুলনায় কর্ম ও আমল খুব কমই হয়ে থাকে। তাছাড়া এতে সময়ও নষ্ট হয়। বিশেষ করে যুগের নবীর কাছে অধিক প্রশ্ন করার একটি ক্ষতিকর দিক এটাও যে, নবীর পক্ষ থেকে যখন উত্তর আসে, তখন দেখা যায়, উম্মতের অনেক পাবন্দীও বেড়ে যায়।

যা হোক, এ সকল কারণেই অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে সাহাবায়ে কেরামকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তারা নিজেরা প্রশ্ন খুবই কম করতেন এবং এ আশায় থাকতেন যে, কোন গ্রাম্য বেদুঈন এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করুক, আর এ সুযোগে আমরা কিছু শুনে শিখে নেই। কারণ, বেদুঈনদের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অনেক অবকাশ ছিল। এ হাদীসেরই এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকেই বর্ণিত হয়েছে, "বেদুঈন লোকটি খুব দুঃসাহসের সাথে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল এবং নির্দ্বিধায় যা মনে আসছিল তাই জিজ্ঞাসা করছিল।" —ফতহুল বারী

বুখারী শরীফে এ হাদীসেরই বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষে যাবার সময় এই বেদুঈন বলেছিল ঃ আমি বনু সা'দ ইবনে বকর গোত্রের এক সদস্য, আমার নাম হচ্ছে যেমাম ইবনে সা'আলাবাহ। আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলাম।

বুখারীর বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, এ লোকটি এসে প্রথমেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল যে, আমি আপনার কাছে কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করব, তবে আমার প্রশ্নের ধরন কিছুটা শক্ত হবে। তাই বলে আপনি আমার উপর রাগ করবেন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ তোমার মনে যা আসে তাই জিজ্ঞাসা কর। তারপর ঐ প্রশ্নোত্তর হল, যা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

প্রশ্নকারী বেদুঈন যাওয়ার সময় কসম খেয়ে যে কথাটি বলেছিল যে, "আমি এতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করব না", সম্ভবত তার এ কথার এ উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি আপনার এ শিক্ষা ও দিক নির্দেশনার সম্পূর্ণ অনুসরণ করব এবং আমার মনের চাহিদায় এতে কোন প্রকার কমবেশী করব না। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, আমি আপনার এই পয়গাম ও বাণী অবিকল এভাবেই আমার গোত্রের কাছে পৌঁছে দিব এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন সংযোজন বা বিয়োজন করব না।

অন্যান্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এ বেদুঈন লোকটি নিজ গোত্রের কাছে গিয়ে খুব উদ্যমের সাথে দ্বীন প্রচারের কাজ শুরু করে দিলেন। তিনি প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে এমন সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বক্তব্য দিতে লাগলেন যে, তার কোন কোন নিকটাত্মীয় ও আপনজন তাকে বলল ঃ হে যেমাম! কুষ্ঠরোগ ও উন্মাদ হওয়া থেকে সাবধান থাক। (অর্থাৎ, দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণ করে কুষ্ঠরোগে যেন আক্রান্ত না হয়ে যাও অথবা তুমি যেন পাগল না হয়ে যাও।)

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার তবলীগ ও দ্বীন প্রচারে এমন বরকত দান করলেন যে, সকাল বেলা যারা তাকে কুষ্ঠরোগ ও পাগলামীতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় দেখাচ্ছিল, সন্ধ্যা বেলায় তারাই

মূর্তিপূজা থেকে তওবা করে তওহীদের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল। ফলে সারা গোত্রে একটি প্রাণীও আর অমুসলিম রইল না।

(٥) عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ اَعْرَابِيًا عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَاَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهٖ (اَوْبِزِمَامِهَا) ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (اَوْ يَا مُحَمَّدُ) اَخْبِرْنِىْ بِمَا يُقَرِّبُنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ فَكَفَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَ فِىْ اَصْحَابِهٖ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُفِّقَ (اَوْ لَقَدْ هُدِىَ) قَالَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَاَعَادَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَّ تُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ – (رواه مسلم)

৫। হযরত আবূ আইয়ুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অথবা তাঁর নাম নিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ!) আমাকে এমন বিষয়ের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতের কাছে পৌঁছে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন। (অর্থাৎ, তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য নিজের উষ্ট্রীকে থামিয়ে দিলেন।) তারপর তিনি নিজ সাথীদের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বললেন ঃ এ লোকটাকে ভাল তওফীক দান করা হয়েছে (অথবা বললেন ঃ তাকে খুবই হেদায়াত দান করা হয়েছে।) তারপর তিনি ঐ বেদুঈন প্রশ্নকারীকে বললেন ঃ আচ্ছা, তুমি আবার বল তো, কি বলছিলে। প্রশ্নকারী তখন পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করল। (অর্থাৎ, আমাকে ঐ বিষয়ের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে সরিয়ে রাখবে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করতে থাক এবং কোন বস্তুকে কোনভাবেই তাঁর সাথে শরীক করো না। নামায কায়েম রাখ, যাকাত প্রদান কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ ও তাদের হক আদায় করে চল। তারপর বললেন ঃ "এবার আমার উষ্ট্রী ছেড়ে দাও।" —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের পথ সুগমকারী ও জাহান্নাম থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকারী আমলসমূহের মধ্য থেকে কেবল (১) আল্লাহ্‌র খাঁটি এবাদত, (২) নামায কায়েম, (৩) যাকাত আদায় ও (৪) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কথাই উল্লেখ করেছেন। এমনকি রোযা এবং হজ্জের কথাও উল্লেখ করেননি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষের জন্য কেবল এ চারটি কাজই যথেষ্ট, এর বাইরে যেসব ফরয-ওয়াজিব রয়েছে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় অথবা গুরুত্বহীন। এমন মনে করা এবং হাদীসে এ ধরনের তথ্য আবিষ্কার করা কিছুতেই সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নকারী একজন ছাত্রকে এ মূলনীতি সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য একজন স্নেহশীল শিক্ষক ও দয়ালু

মুরুব্বী, তিনি কোন লিখক ও গ্রন্থপ্রণেতা নন। আর একজন স্নেহশীল শিক্ষকের রীতি-পদ্ধতি এটাই হয় এবং এটাই সঠিক পদ্ধতি যে, তিনি যে ক্ষেত্রে যে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া বেশী উপযোগী মনে করেন, সে ক্ষেত্রে ততটুকুই বাতলে দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে লিখকদের রীতি এই যে, তারা যখন কোন বিষয়ের উপর কলম ধরেন, তখন এর চতুর্দিক এবং খুঁটিনাটি সকল বিষয় সেখানে আলোচনা করে থাকেন। তাই কোন স্নেহশীল শিক্ষক ও দীক্ষাগুরুর শিক্ষা এবং দীক্ষাকর্মেও ঐ লিখক ও কলাকুশলীদের এই রীতি-পদ্ধতি খুঁজতে যাওয়া আসলে নিজের বোধশক্তির অপরিপক্বতারই পরিচায়ক।

অতএব, রোযা, হজ্জ ও জেহাদ ইত্যাদির উল্লেখ যে এই হাদীসে করা হয়নি, এর কারণ এটাই যে, উপস্থিত সময়ে ঐ প্রশ্নকারীকে এই চারটি বিষয়ের উপদেশ ও উৎসাহ দানেরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর এর কারণও সম্ভবতঃ এই হবে যে, সাধারণতঃ এই চারটি বিষয়েই মানুষের পক্ষ হতে বেশী ত্রুটি হয়ে থাকে। অর্থাৎ, নামায কায়েম, যাকাত আদায় ও আত্মীয়তা রক্ষায় মানুষের অবহেলা ও ত্রুটি এবং আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার আশংকা অন্যান্য ক্ষেত্রের ত্রুটির চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। বর্তমানেও আমরা দেখি যে, রোযা এবং হজ্জ যাদের উপর ফরয, তাদের মধ্যে এগুলোর পরিত্যাগকারী এত অধিক নয়, যতটুকু নামায, যাকাত ও আত্মীয়তা রক্ষা তথা হুকূকুল ইবাদের বেলায় দেখা যায় অথবা প্রকাশ্য কিংবা গোপন কোন ধরনের শিরকে লিপ্ত হওয়ার যে প্রবণতা দেখা যায়। এমন মানুষ তো সম্ভবতঃ খুঁজেও পাওয়া যাবে না, যারা নামায, যাকাত ও অন্যান্য হুকূকুল ইবাদের বেলায় পূর্ণ যত্নবান, অথচ রোযা ও হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও এগুলো আদায় করে না। কিন্তু আপনি এমন লোকের সংখ্যা গুণেও শেষ করতে পারবেন না, যারা রমযান আসলে রোযা তো রেখে নেয়; কিন্তু নামাযের পাবন্দী করে না অথবা কেউ হজ্জ তো করে নেয়; কিন্তু যাকাত এবং আত্মীয়তা রক্ষা ইত্যাদি হুকূকুল ইবাদের বেলায় খুবই অবহেলা করে। সারকথা, এই কারণেই সম্ভবতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে কেবল এই চারটি বিষয়ের শিক্ষা দিয়েই বক্তব্য শেষ করেছেন।

মুসলিম শরীফে এ হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় শেষের দিকে এই বাক্যটিও এসেছে যে, যখন বেদুঈন লোকটি চলে গেল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই লোকটি যদি দৃঢ়ভাবে এই বিধানসমূহের উপর আমল করতে থাকে, তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

এই হাদীসের বর্ণনায় তিনটি স্থানে 'রাবী' নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করেছেন ঃ (১) উষ্ট্রীর লাগাম বুঝানোর জন্য ঊর্ধতন বর্ণনাকারী 'খেতাম' শব্দ ব্যবহার করেছেন, না 'যেমাম' শব্দ। (২) প্রশ্নকারী লোকটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করতে গিয়ে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলেছিলেন, না 'ইয়া মুহাম্মদ'। (৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের কাছে লোকটি সম্পর্কে 'সে ভাল বিষয়ের তওফীক পেয়েছে' বলেছিলেন, না 'সে খুব হেদায়াত লাভ করেছে' বলেছিলেন। রাবীর এই সন্দেহ প্রকাশ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, আমাদের হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কি পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং এ ব্যাপারে তারা আল্লাহ্‌কে কেমন ভয় করতেন যে, তিনটি স্থানে তাদের সন্দেহ হয়েছে যে, ঊর্ধতন রাবী এ শব্দ বলেছিলেন, না ঐ শব্দ। তাই তারা এ সন্দেহটুকুও প্রকাশ করে দিলেন, যদিও এ শব্দের ভিন্নতার কারণে অর্থে সামান্য কোন পার্থক্যও আসত না।

এই হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদেরও কিছুটা অনুমান করা যায় যে, তিনি সফরে বেরিয়েছেন, উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে যাচ্ছেন। (আর এটাও প্রকাশ্য বিষয় যে, তাঁর এ সফর অবশ্যই কোন দ্বীনী কাজ উপলক্ষ্যেই ছিল।) পথিমধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বেদুঈন ব্যক্তি এসে উষ্ট্রীর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে জান্নাতের পথ সুগমকারী ও জাহান্নাম থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকারী বিষয়ের কথা বলে দিন।" তিনি তার এই কর্মপদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন না; বরং তার দ্বীনী আগ্রহের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছেন এবং নিজের সফরসঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন ঃ "সে খুব ভাল বিষয়ের তওফীক লাভ করেছে।" তারপর নিজের সাথীদেরকে প্রশ্নকারীর মুখে তার প্রশ্নটি শুনানোর জন্য বলছেন, "তুমি কি বলছিলে তা আবার বল।" তারপর তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এবং শেষে বলছেন, "এবার আমার উষ্ট্রী ছেড়ে দাও।"

আল্লাহু আকবার! পয়গাম্বরী কী জিনিস! স্নেহ ও দয়ার মূর্ত প্রতীক। তবে এখানে এ কথাটিও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, এই প্রশ্নকারী ছিল একজন বেদুঈন। তাই তার জন্য যা সাজে, অন্যের জন্যও তা শোভনীয় হবে এমন কথা নয়।

(٦) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهٖ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَ ذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكٰوةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ – (رواه البخارى ومسلم)

৬। তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নজদ অঞ্চলের এক ব্যক্তি- যার মাথার চুলগুলো ছিল খুবই অবিন্যস্ত— রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে (কিছু বলতে বলতে) হাজির হল। আমরা তার গুন-গুন আওয়াজ শুনছিলাম; কিন্তু (আওয়াজ অস্পষ্ট থাকার কারণে এবং সম্ভবতঃ দূরত্বের কারণেও) আমরা তার কথা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে গেল। এবার দেখা গেল, সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। (অর্থাৎ, সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করল ঃ আমাকে ইসলামের ঐ বিশেষ বিধি-বিধান বাতলে দিন, মুসলমান হিসাবে যেগুলোর উপর আমল করা আমার জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী।) তিনি বললেন ঃ দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, (যেগুলো ফরয এবং ইসলামে এটাই সর্বপ্রথম দায়িত্ব।) লোকটি আরয করল, এগুলো ছাড়া আরো কোন নামায কি আমার জন্য অপরিহার্য ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ না, (ফরয তো কেবল এই পাঁচ ওয়াক্তই) তবে তোমার এ

অধিকার আছে যে, তুমি নিজের পক্ষ থেকে এবং মনের খুশীতে এই পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছাড়াও আরো কিছু নফল নামায আদায় করবে (এবং বাড়তি সওয়াব লাভ করবে।) তারপর তিনি বললেন ঃ বছরে পুরা রমযান মাসের রোযা ফরয স্থির করা হয়েছে। (আর এটা ইসলামের দ্বিতীয় সাধারণ কর্তব্য।) সে জিজ্ঞাসা করল, রমযানের রোযা ছাড়া অন্য কোন রোযাও কি আমার জন্য জরুরী ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ না। (ফরয তো কেবল রমযানের রোযাই) তবে তোমার এই অধিকার আছে যে, তুমি মনের খুশীতে আরো কিছু নফল রোযা রাখবে, (এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অতিরিক্ত নৈকট্য ও সওয়াব লাভ করবে।) বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে ফরয যাকাতের কথাও আলোচনা করলেন। এখানেও প্রশ্নকারী লোকটি ঐ কথাই বলল যে, এই যাকাত ছাড়া অন্য কোন দান-খয়রাত করাও কি আমার জন্য জরুরী হবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। (ফরয তো কেবল যাকাত আদায় করাই) তবে তুমি মনের খুশীতে নফল দান-খয়রাত করতে পার, (এবং এভাবে বাড়তি সওয়াব লাভ করতে পার।) হাদীসের বর্ণনাকারী তাল্হা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ বলেন, তারপর প্রশ্নকারী লোকটি ফিরে গেল এবং ফিরে যাওয়ার সময় সে বলছিল ঃ (আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলেছেন) এতে আমি (নিজের পক্ষ থেকে) কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একথা শুনে বললেন ঃ লোকটি সফলকাম, যদি সে তার কথায় ঠিক থাকে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে শেষ রুকন তথা হজ্জের উল্লেখ নেই। এর একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, এই ঘটনাটিই হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বেকার। কেননা, প্রসিদ্ধ মত হিসাবে হজ্জ ফরয হওয়ার বিধানটি এসেছে অষ্টম অথবা নবম হিজরীতে। তাই এটা সম্ভব যে, এই ঘটনাটি এর পূর্বেকার।

দ্বিতীয়তঃ, একথাও বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে হজ্জ এবং ইসলামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আহ্কামের আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করার সময় আলোচনাটি সংক্ষেপ করে দিয়েছেন। একটু অনুসন্ধান করলে বিষয়টি এমনই মনে হয়। প্রমাণ হিসাবে বুখারী শরীফে বর্ণিত এই হাদীসেরই একটি বর্ণনা পেশ করা যায়, যেখানে নামায, রোযা এবং যাকাতের আলোচনার পর হাদীসের বর্ণনাকারী তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই শব্দমালাও বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে ইসলামের অনেক বিধান বাতলে দিলেন। (তাই এখানে হয়তো হজ্জের বিধানটিও উল্লেখ করেছিলেন।)

ইসলামের বিধি-বিধানের দাওয়াত প্রদানে ধারাবাহিকতা ও ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَعَاذِبْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ سَتَاْتِىْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلٰى اَنْ يَّشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذَالِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذَالِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ

فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ – (رواه البخارى ومسلم)

৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)কে ইয়ামন পাঠালেন, তখন তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে বললেন ঃ তুমি সেখানে আহ্লে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে। অতএব, তুমি যখন তাদের কাছে যাবে, তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে এই কথার দিকে আহ্বান করবে যে, তারা যেন মনেপ্রাণে এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল। তারা যদি তোমার এই কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে বলে দেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারপর তারা যখন তোমার এ কথাও মেনে নেবে, তখন তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর যাকাতও ফরয করেছেন, যা তোমাদের বিত্তবানদের থেকে নেয়া হবে এবং তোমাদেরই গরীব ব্যক্তিদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হবে। তারপর তারা যদি তোমার একথাটিও মেনে নেয়, তাহলে (যাকাত আদায় করার সময় বেছে বেছে) তাদের মূল্যবান সম্পদ নিয়ে নেবে না। আর মজলূমের বদদো'আকে ভয় কর। কেননা, তার মাঝে এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা ও অন্তরায় থাকে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী প্রমুখ কতিপয় আলেমের অনুসন্ধান অনুযায়ী ১০ম হিজরীতে, আর অধিকাংশ সীরাতকার ও ঐতিহাসিকের মত অনুযায়ী ৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনের শাসনকর্তা হিসাবে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাকে বিদায় দেওয়ার সময় ইয়ামনবাসীকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিছু লোকের দৃষ্টিতে এই হাদীসেও এই আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল নামায-রোযার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, অথচ ঐ সময় রোযা এবং হজ্জ ফরয হওয়ার বিধানটিও এসে গিয়েছিল। হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ নিজেদের উপলব্ধি অনুযায়ী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই অধমের নিকট এসব ব্যাখ্যার মধ্যে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও মনঃপূত ব্যাখ্যা এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আযকে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সেখানে ইসলামের সকল বিধি-বিধান বর্ণনা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, ইসলাম গ্রহণের পর একজন মুসলমানের জন্য যেগুলো পালন করা অপরিহার্য হয়ে যায়। তাঁর উদ্দেশ্য কেবল এই ছিল যে, দ্বীনের দাওয়াত ও ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারের বেলায় একজন দাওয়াতদানকারী ও শিক্ষককে যে ক্রমধারা ও ক্রমোন্নতির নীতি অনুসরণ করতে হয়, হযরত মো'আযকে তাই বলে দেওয়া। আর নীতিটি হচ্ছে এই যে, ইসলামের সকল বিধি-বিধান ও আবেদন এবং শরীঅতের সকল আদেশ-নিষেধ একসাথে মানুষের সামনে তুলে ধরবে না। কেননা, এমন করলে ইসলাম গ্রহণ করাই মানুষের জন্য কঠিন মনে হবে; বরং সর্বপ্রথম তাদের সামনে তওহীদ ও রেসালতের বিষয় পেশ করবে। যখন তারা এটা গ্রহণ করে নেবে, তখন তাদেরকে বলা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যিনি আমাদের এবং তোমাদের একক রব এবং

লা-শারীক মাওলা, তিনি আমাদের সবার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারপর তারা যখন এ বিষয়টিও মেনে নেবে, তখন বলবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সম্পদে যাকাতও ফরয করেছেন, যা সমাজের বিত্তবানদের থেকে আদায় করে অভাবী শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে।

যাহোক, হযরত মো'আয (রাঃ)কে এই নির্দেশনা দেওয়ার মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল দাওয়াত ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে ক্রমধারা ও ক্রমোন্নতির প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতির অনুসরণ করতে হয়, তা বলে দেওয়া। অন্যথায় ইসলামের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের জ্ঞান তো হযরত মো'আযের পূর্বেই ছিল। তাই এ ক্ষেত্রে সবগুলো বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না।

তাছাড়া এ ব্যাপারেও তো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইসলামের বিধি-বিধানের মধ্যে নামায এবং যাকাতই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন মজীদেও এ দু'টি বিষয়ের প্রতিই জোর তাকীদ করা হয়েছে, যার একটি কারণ এও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি এই দু'টি বিধান পালন করবে, তার জন্য অন্যান্য আহকাম ও ফরযসমূহ আদায় করা অনেক সহজ হয়ে যাবে, যেমনটি অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষ দর্শনেও বুঝা যায়। এ ছাড়া মানুষের মন-মানসিকতা সুন্দর ও সুস্থ করে গড়ে তুলতে এই দু'টি জিনিসের বিশেষ ভূমিকা থাকে। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন ও হাদীসের অনেক স্থানে কেবল এ দু'টি বিধানের আলোচনা করা হয়। যেমন, সূরা বায়্যেনায় এরশাদ হয়েছে ঃ "তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হচ্ছে সঠিক ধর্ম।" অনুরূপভাবে সূরা তওবায় এরশাদ হয়েছে ঃ "তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" সামনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস আসছে, সেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মানুষের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দেবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। অতএব, উপরোল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসসমূহে ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহের মধ্যে কেবল নামায ও যাকাতের কথা উল্লেখ করার এটিও একটি কারণ।

ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা প্রসঙ্গে এই দিকনির্দেশনা দেওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মো'আযকে একটি উপদেশ দিলেন যে, যখন যাকাত সংগ্রহ করার সময় আসবে, তখন এমনটি করতে যাবে না যে, মানুষের সম্পদ তথা উৎপন্ন ফসল ও গবাদি পশুর মধ্য থেকে কেবল উত্তম ও মূল্যবান জিনিসগুলো বাছাই করতে যাবে; বরং যে প্রকার সম্পদ হবে সেখান থেকে মধ্যম মানের জিনিসটি আদায় করবে।

সর্বশেষ উপদেশ তিনি এই দিয়েছিলেন যে, দেখ! মজলূমের বদদো'আ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। (অর্থ এই যে, তুমি একটি অঞ্চলের শাসক হয়ে যাচ্ছ। তাই সাবধান! কখনো কারো প্রতি যেন জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়ি না হয়।) কেননা, মজলুমের দো'আ এবং আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে কোন পর্দা ও অন্তরায় থাকে না; সেটা কবূল হয়েই যায়।

মুসনাদে আহ্মাদে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন ঃ মজলূমের দো'আ কবূল হয়েই থাকে,

সে যদি পাপাচারীও হয়। পাপাচারী হলে তার পাপের ভোগান্তি তারই জন্য থাকবে। —ফতহুল বারী, উমদাতুল কারী

অর্থাৎ, পাপাচারী হওয়া সত্ত্বেও জালেমের বিরুদ্ধে তার বদদো'আ কবূল হয়ে যাবে।

মুসনাদে আহমাদেই হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনাসূত্রে এই শব্দমালাও এসেছে ঃ মজলূমের বদদো'আ অবশ্যই কবূল হয়ে থাকে, এমন কি সে যদি কাফেরও হয়। কেননা, এখানে কোন অন্তরায় থাকে না। —উমদাতুল কারী

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ এ হাদীস দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রেসালতের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর আনীত শরীঅতের উপর চলা পূর্ববর্তী নবী ও পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহের অনুসারী 'আহ্‌লে কিতাবে'র জন্যও জরুরী। পূর্ববর্তী ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের এ যুগে মুসলমান বলে কথিত লোকদের মধ্য থেকে কোন কোন লেখা-পড়া জানা মানুষও এই ধারণা প্রকাশ করে যে, "ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মত সম্প্রদায়গুলো তাদের পুরাতন শরীঅত অনুসরণ করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের মুক্তি লাভ করতে পারবে এবং তাদের জন্য ইসলামী শরীঅতের অনুসরণ জরুরী নয়।" এ ধরনের মত পোষণকারীরা হয়তো দ্বীন এবং দ্বীনের মূলনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা আসলে এরা মুনাফেক। সামনের হাদীসে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না এবং তাঁর আনীত দ্বীনকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেবে না, সে নাজাত ও মুক্তি লাভ করতে পারবে না

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ - (رواه مسلم)

৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন, এ উম্মতের (অর্থাৎ এ যুগের) যে কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান আমার সংবাদ শুনবে, (অর্থাৎ, আমার নবুওয়াতের দাওয়াত তার কানে পৌঁছবে) তারপরও সে আমার প্রতি এবং আমার আনীত দ্বীনের প্রতি ঈমান না এনেই মারা যাবে, সে অবশ্যই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের কথা কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের মত স্বীকৃত আহলে কিতাবও যখন শেষ নবীর প্রতি ঈমান না এনে এবং তাঁর আনীত দ্বীন ও শরীঅত গ্রহণ না করে মুক্তি লাভ করতে পারবে না, তাহলে অন্যান্য কাফের ও মুশরিকদের পরিণতি কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

যাহোক, হাদীসের বিষয়বস্তুটি ব্যাপক এবং এর মর্ম হচ্ছে এই যে, এ মুহাম্মদী যুগে (যার সূচনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে এবং

কেয়ামত পর্যন্ত যা চালু থাকবে) যার কাছে তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতের দাওয়াত পৌঁছবে আর সে তাঁর প্রতি ঈমান না এনে এবং তাঁর আনীত দ্বীনকে নিজের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ না করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে যাবে যদিও সে কোন পূর্ববর্তী নবীর দ্বীন ও তাঁর আনীত কিতাব ও শরীঅতের অনুসারী কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টানই হোক না কেন।

সারকথা, খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁর প্রতি ঈমান না এনে এবং তাঁর শরীঅত কবূল না করে কারো পক্ষে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যার কাছে তাঁর নবুওয়াতের সংবাদ এবং ইসলামের দাওয়াতই পৌঁছেনি, সে হবে ক্ষমার্হ। এ বিষয়টি দ্বীন ইসলামের অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করা কেবল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রেসালতের পদমর্যাদা উপলব্ধি না করার কারণেই হতে পারে।

(٩) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً مِنَ النَّصَارٰى مُتَمَسِّكًا بِالْاِنْجِيْلِ وَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ مُتَمَسِّكًا بِالتَّوْرَاةِ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَتَّبِعْكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ سَمِعَ بِيْ مِنْ يَهُوْدِيٍّ اَوْ نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ لَمْ يَتَّبِعْنِيْ فَهُوَ فِي النَّارِ – (اخرجه الدار قطنى فى الافراد)

৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একজন খৃষ্টান ব্যক্তি ইনজীলের অনুসরণ করে, অনুরূপভাবে একজন ইয়াহুদী তাওরাতের উপর আমল করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসও রাখে, কিন্তু আপনার দ্বীনের অনুসরণ করে না। আপনি বলুন তো, তাদের জন্য কি বিধান ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান আমার নবুওয়াতের কথা শুনবে, অথচ আমার অনুসরণ করবে না, সে হবে জাহান্নামী। —দারাকুতনী

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীসটি উপরে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের চেয়েও এ বিষয়ে অধিক স্পষ্ট যে, কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকারও করে নেয়, (অর্থাৎ, সে যদি তওহীদে বিশ্বাসী হয় এবং রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী বলে স্বীকারও করে নেয়,) কিন্তু তাঁর আনীত শরীঅতের পরিবর্তে তাওরাত ও ইনজীলেরই অনুসরণ করে যায় এবং এটাকেই নিজের মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করে, তাহলে সে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। এ সত্যটিকেই কুরআন মজীদের এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩১)

ব্যাখ্যা ঃ হে নবী! (যে সব লোক আপনার শরীঅত অনুসরণ না করেই আল্লাহ্কে পেতে চায় এবং তাঁর ক্ষমা লাভের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদেরকে) আপনি বলে দিন যে, তোমরা যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্কে চাও, তাহলে (এখন আর এর কোন বিকল্প পথ নেই যে,) তোমরা

আমার শরীঅতের অনুসরণ করবে। (যদি তোমরা এমনটি কর তাহলে) আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। (আর যদি তোমরা আমার অনুসরণ না কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ্র ভালবাসা ও তাঁর ক্ষমা লাভের অধিকারী হতে পারবে না।)

সত্যিকার ঈমান ও ইসলাম মানুষের মুক্তির গ্যারান্টি

(١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَوْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (شَكَّ الْاَعْمَشُ) قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَاَكَلْنَا وَدَّهَنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) افْعَلُوْا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلٰكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَ فِىْ ذَالِكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَعَمْ فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبُسِطَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْئُ بِكَفِّ ذُرَةٍ قَالَ وَجَعَلَ يَجِيْئُ الْاٰخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ قَالَ وَيَجِيْئُ الْاٰخَرُ بِكَسْرَةٍ حَتّٰى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَالِكَ شَيْئٌ يَسِيْرٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ خُذُوْا فِىْ اَوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَاَخَذُوْا فِىْ اَوْعِيَتِهِمْ حَتّٰى مَا تَرَكُوْا فِى الْعَسْكَرِ وِعَاءً اِلَّا مَلَئُوْهُ قَالَ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، لَا يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ – (رواه مسلم)

১০। আ'মাশ নামক তাবেয়ী আপন উস্তাদ আবু সালেহ থেকে এ সন্দেহ সহকারে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা অথবা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাবুক যুদ্ধের সময় যখন (মুসলমানদের সব পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেল এবং) ক্ষুধার খুব কষ্ট শুরু হল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি অনুমতি দান করেন, তাহলে আমরা আমাদের পানি বহনকারী উটগুলি যবেহ করে এর গোশ্ত খেয়ে নিতে পারি এবং তেলও সংগ্রহ করে নিতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, তাই কর। বর্ণনাকরী বলেন, এমন সময় ওমর (রাঃ) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি এমনটি করেন, (অর্থাৎ, লোকদেরকে যদি উট যবেহ করার অনুমতি দিয়ে ফেলেন আর তারা এগুলো যবেহ করে ফেলে) তাহলে আমাদের বাহনের সংখ্যা কমে যাবে। (তাই দয়া করে এমন যেন না করা হয়।) তবে আপনি তাদেরকে তাদের হাতে সঞ্চিত যৎসামান্য খাদ্য-সামগ্রীসহই আপনার কাছে আসতে বলুন। তারপর এতেই তাদেরকে বরকত দেওয়ার জন্য আপনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। হয়তো এতেই আল্লাহ্ তাদেরকে বরকত দান করবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর তিনি চামড়ার তৈরী একটি বড় দস্তরখান আনতে বললেন এবং তা এনে বিছানো হল। তারপর তিনি সবাইকে নিজেদের উদ্বৃত্ত খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসতে বললেন। দেখা গেল, কেউ তখন এক মুঠো চিনার দানা নিয়ে হাজির হচ্ছে, কেউ এক মুঠো

খেজুর নিয়ে আসছে আবার কেউ রুটির একটি টুকরা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। এভাবে দস্তরখানে অল্প বিস্তর খাদ্য-সামগ্রী জমা হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে বরকতের দো'আ করলেন এবং সবাইকে বললেন, এখন তোমরা এখান থেকে নিজ নিজ পাত্র ভরে নিয়ে যাও। কথা মত সবাই নিজ নিজ পাত্র পূর্ণ করে নিল। এমনকি (ত্রিশ হাজার সৈন্যের এই বাহিনীর) লোকেরা একটি পাত্রও অপূর্ণ রাখল না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারপর সবাই আহার করল এবং তৃপ্তিসহকারেই আহার করল, এরপরও কিছু উদ্বৃত্ত রয়ে গেল। এই অবস্থাদৃষ্টে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র যে কোন বান্দা কোন সংশয়-সন্দেহ ছাড়া পূর্ণ বিশ্বাসসহ এ দু'টি সাক্ষ্য নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হবে না।" —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বিষয়বস্তুটি স্পষ্ট। এখানে যে উদ্দেশ্যে হাদীসটি আনা হয়েছে, এর সম্পর্ক হাদীসের শেষাংশের সাথে, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র তওহীদ ও নিজের রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান করে এই ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এই দু'টি সাক্ষ্য প্রদান করে ও তার অন্তর ও মস্তিষ্কে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের রোগ না থাকে এবং এই ঈমানী অবস্থায় তার মৃত্যু আসে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যারা কুরআন হাদীসের বাক-পদ্ধতি ও বর্ণনা-ভঙ্গী সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকেফহাল, তারা জানে যে, এসব ক্ষেত্রে "আল্লাহ্র তওহীদ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান"-এর অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানী দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং তাঁর আনীত দ্বীন ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসাবে বরণ করে নেওয়া। এই জন্যই এই দুই কথার সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ যুগযুগ ধরে এটাই মনে করা হয় যে, ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানী দাওয়াতকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসাবে বরণ করে নিয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যের মর্ম এটাই যে, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে আমার ঈমানী দাওয়াত গ্রহণ করে নিয়ে ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেবে, সে যদি এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হয় এবং এ বিশ্বাস নিয়েই মারা যায়, তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

অতএব, কেউ যদি শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এই কথা মুখে স্বীকার করে নেয়; কিন্তু ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ না করে, বরং অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে অথবা তওহীদ ও রেসালত ছাড়া অন্য কোন ঈমানী বিষয়কে অস্বীকার করে, যেমন কেয়ামত অথবা কুরআন মজীদকে সত্য বলে স্বীকার না করে, তাহলে সে কখনো এ সুসংবাদের অধিকারী হবে না।

মোটকথা, এ হাদীসে তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানের অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানী দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেওয়া। অনুরূপভাবে যেসব হাদীসে শুধু তওহীদের উপর অথবা কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র স্বীকৃতির উপর জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে সেখানেও এই অর্থই গ্রহণ করতে

হবে। আসলে এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানী দাওয়াত গ্রহণ ও ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসাবে কবূল করে নেওয়ারই বিভিন্ন পরিচিত শিরোনাম। ইনশাআল্লাহ এর আরো কিছু বিস্তারিত আলোচনা সামনের হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার সময় করা হবে।

এ হাদীস থেকে আনুসঙ্গিকভাবে আরো কয়েকটি শিক্ষা লাভ করা যায় ঃ

(১) কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব, এমনকি আল্লাহ্‌র কোন নবী-রাসূলও যদি কোন বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করেন আর কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ খাদেমের দৃষ্টিতে এতে কোন ক্ষতিকর দিক নজরে আসে, তাহলে সে বিনয়ের সাথে নিজের মত ও পরামর্শ পেশ করতে কুণ্ঠিত হবে না। আর বড় ব্যক্তির জন্যও উচিত হবে এতে চিন্তা-ভাবনা করা। তারপর যদি দ্বিতীয় মতটিই ভাল এবং বেশী উপযোগী মনে হয়, তাহলে নিজের পূর্বমত থেকে ফিরে এসে দ্বিতীয় মতটিই গ্রহণ করে নেওয়া। (যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনায় হযরত ওমরের মতটি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।)

(২) দো'আ কবূল হওয়া, বিশেষতঃ অলৌকিকভাবে দো'আর ফল প্রকাশ পাওয়া-এটা আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন এবং বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার পরিচায়ক। এর দ্বারা মু'মিনদের অন্তরের প্রশান্তি ও বক্ষ উন্মোচনে উন্নতি হওয়াই যথার্থ, বরং এটা নবুওয়াতের উত্তরাধিকার। (যেমন, এক্ষেত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালেমায়ে শাহাদত পাঠ দ্বারা প্রকাশ্যভাবেই এ বিষয়টি বুঝা যায়।) অতএব, আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন ও তাঁর অনুগ্রহের অর্থাৎ, মু'জেযার আলোচনা করলে যাদের অন্তর উন্মোচিত হওয়ার পরিবর্তে সংকুচিত হয়ে আসে অথবা যারা এই ধরনের অলৌকিক বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশা ও বিদ্রূপ করে, মনে করতে হবে যে, তাদের অন্তর ভীষণ রোগে আক্রান্ত।

(١١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ – (رواه مسلم)

১১। হযরত উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসটির ব্যাখ্যার যেমন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এখানেও সেই আলোকেই ধরে নিতে হবে যে, এ হাদীসে তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দানের অর্থ হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেওয়া এবং সে অনুযায়ী চলা। অন্য শব্দে একথাও বলা যায় যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এ কথার সাক্ষ্য দানের মধ্যে সম্পূর্ণ ইসলাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে, সে আসলে পূর্ণ ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নিয়েছে। এখন যদিও একান্ত মানবীয় দুর্বলতার কারণে তার পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েই যায়, তাহলে তার ঈমানী অনুভূতিই তাকে শরীঅতনির্ধারিত পন্থায় কাফ্‌ফারা আদায় করে অথবা তওবা করে পবিত্র হয়ে যেতে বাধ্য করবে। তাই সে যদি পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদই থাকবে।

(١٢) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُ اِلَّا مُؤْخَرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ * (رواه البخارى ومسلم واللفظ له)

১২। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই সওয়ারীতে আরোহী ছিলাম। আমি এমনভাবে সওয়ারীর পেছনে বসা ছিলাম যে, আমার মাঝে ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে উটের হাওদার পেছনের অংশ ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় ছিল না। (অর্থাৎ, আমি হুযূরের পেছনে সম্পূর্ণ মিশে বসা ছিলাম।) এমন সময় তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে মো'আয ইবনে জাবাল! আমি উত্তর দিলাম, আমি হাজির আছি, আপনি বলুন। তারপর কিছু সময় চলার পর তিনি আবার বললেন ঃ হে মো'আয ইবনে জাবাল! আমি উত্তর দিলাম, আমি হাজির আপনি বলুন। তারপর আরো কিছুক্ষণ চলার পর আবার বললেন ঃ হে মো'আয ইবনে জাবাল! আমি বললাম, আমি হাজির আপনি বলুন। (এই তৃতীয়বারে) তিনি বললেন ঃ তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কি হক ও দাবী রয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহ্‌র এ হক রয়েছে যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। তারপর কিছুক্ষণ চলার পর আবার বললেন ঃ হে মো'আয ইবনে জাবাল! আমি উত্তর দিলাম, আমি হাজির, আপনি বলুন। তিনি তখন বললেন ঃ তুমি কি জান, বান্দারা যখন আল্লাহ্‌র এ হক আদায় করে নেবে, তখন তাদের কি হক থাকে আল্লাহ্‌র উপর? আমি উত্তরে বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ তাদের এই হক থাকে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে আযাবে ফেলবেন না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ঃ (১) হযরত মো'আয (রাঃ) মূল হাদীস বর্ণনা করার আগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই সওয়ারীতে আরোহণ ও হুযূরের সাথে একেবারে মিশে বসার বিষয়টি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, এর কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহদৃষ্টি হযরত মো'আযের প্রতি ছিল এবং দরবারে নবুওয়াতে তিনি যে নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন, এ বিষয়টি শ্রোতাদের চোখের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা বুঝে নিতে পারে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আযের কাছে এমন একটি কথা কেন

বললেন, সাধারণ মুসলমানদের কাছে যা প্রকাশ করতে তিনি রাজী ছিলেন না। যেমন, সামনের হাদীসে এ বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ আসবে।

দ্বিতীয় কথা এই বলা যায় যে, সম্ভবতঃ হযরত মো'আয (রাঃ) হাদীসটির ব্যাপারে নিজের প্রত্যয় ব্যক্ত করার জন্য এত বিস্তারিতভাবে অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ, শ্রোতাদেরকে তিনি বুঝাতে চান যে, এ হাদীসটি আমার এমন স্মরণ আছে যে, হাদীস বর্ণনা করার সময়কার সব খুঁটিনাটি অবস্থাও আমি বলতে পারি, সব কিছুই আমার কাছে সংরক্ষিত।

তৃতীয় কারণ এও হতে পারে যে, প্রেমিকদের যেমন অভ্যাস থাকে যে, তারা ভালবাসার স্মৃতি ও প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যের বিষয়গুলো অত্যন্ত আবেগের সাথে মজা নিয়ে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে থাকে, সেই হৃদয়ানুভূতি নিয়েই হযরত মো'আয হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যের কথাগুলো এভাবে বর্ণনা করেছেন।

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য বিরতি দিয়ে দিয়ে হযরত মো'আযকে তিনবার ডাক দিলেন এবং তিনি যা বলতে চাচ্ছিলেন তার একাংশ মাত্র তৃতীয় দফায় বললেন এবং দ্বিতীয় অংশটি আবার কিছুটা বিরতি দিয়ে চতুর্থবারে বললেন, এর রহস্য কি ? এর উত্তরে হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন যে, সম্ভবতঃ এভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আযের মনোযোগ আকর্ষণ করছিলেন, যাতে তিনি আপাদ-মস্তক কান হয়ে পূর্ণ আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে এবং চিন্তা-ভাবনার সাথে তাঁর বক্তব্যটি শ্রবণ করেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এ করা হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ব্যাপারে সংশয় ও দ্বিধা ছিল যে, মো'আয (রাঃ)-এর নিকট তিনি এ কথাটি বলবেন, না না বলাই ভাল হবে। এ জন্যই তিনি প্রথম তিনবার বিরত থাকলেন এবং পরে যখন মনে সায় দিল, তখন বলেই ফেললেন। কিন্তু এ অধম সংকলকের কাছে এ দু'টি ব্যাখ্যাই অপেক্ষাকৃত কম গ্রহণযোগ্য। অধিক যুক্তিযুক্ত ও উপযোগী ব্যাখ্যা এ মনে হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তখন বিশেষ ধ্যানমগ্নতার অবস্থা বিরাজ করছিল। তিনি হযরত মো'আযকে সম্বোধন করতেন এবং কিছু বলার পূর্বেই ঐ ধ্যানমগ্নতায় ফিরে যেতেন। এই কারণেই সম্বোধন ও বক্তব্য প্রদানের মাঝে এ বিলম্ব ও বিরতি ঘটেছে। বাকী আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(৩) মূল হাদীসের সারকথা শুধু এটাই যে, বান্দাদের উপর আল্লাহ্র এ হক ও দাবী রয়েছে যে, তারা তাঁর এবাদত ও গোলামী করে যাবে এবং কোন বস্তুকেই তাঁর সাথে শরীক করবে না। আর তারা যখন আল্লাহ্র এ হক আদায় করে নেবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও নিজের জিম্মায় তাদের এ হক সাব্যস্ত করে নিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে আযাবে ফেলবেন না।

এ হাদীসেও "আল্লাহ্র এবাদত করা এবং শিরক পরিহার করা" দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বীনে তওহীদ অর্থাৎ ইসলামকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং এর উপর জীবন অতিবাহিত করা। যেহেতু সে সময়ে ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং স্পষ্ট পার্থক্যকারী জিনিস তওহীদ এবং শিরকই ছিল, এ জন্য এই হাদীসে (এবং কতিপয় অন্যান্য হাদীসেও) এই শিরোনাম অবলম্বন করা হয়েছে। তাছাড়া এটাও বাস্তব কথা যে, আল্লাহ্র এবাদত ও গোলামী করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকাই ইসলামের প্রাণ এবং এর মূল ভিত্তি। এ জন্যও অনেক জায়গায় ইসলামের জন্য এ শিরোনাম অবলম্বন করা হয়। এ কথার সমর্থন (যে, এ হাদীসে আল্লাহ্র এবাদত করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার অর্থ দ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করে নেওয়া) এর দ্বারাও পাওয়া যায়

যে, বুখারী ও মুসলিমেই হযরত মো'আয বর্ণিত এ হাদীসেরই এক বর্ণনায় তওহীদ ও রেসালত উভয়টির উপর ঈমান আনা এবং উভয়টির সাক্ষ্যদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। (হাদীসটি ১৩ নং ক্রমিকে আসছে।) আর অন্য এক বর্ণনায় তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানের সাথে নামায এবং রোযারও উল্লেখ রয়েছে। (এই বর্ণনাটি মুসনাদে আহ্মদের বরাতে সামনের হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটু পরেই আসবে।)

(١٣) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ، قَالَ يَا مُعَاذ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ، قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ سَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهٖ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُخْبِرُبِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ اِذًا يَتَّكِلُوْا فَاَخْبَرَبِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ تَاَثُّمًا * (رواه البخارى و مسلم)

১৩। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় যখন মো'আয (রাঃ)কে নিজের সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে সফর করছিলেন, তখন তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে মো'আয! মো'আয উত্তর দিলেন, আমি হাজির। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন ঃ হে মো'আয! তিনি উত্তর দিলেন, আমি হাজির। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে মো'আয! তিনি উত্তর দিলেন, আমি হাজির। তিনবার এভাবে ডাকার পর তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যক্তিকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দেবেন। হযরত মো'আয এ সুসংবাদ শুনে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি লোকদেরকে এ সংবাদ শুনিয়ে দেব না, যাতে তারা আনন্দ লাভ করতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ এমন করলে তো তারা এর উপর ভরসা করেই বসে থাকবে। তারপর মো'আয (রাঃ) এলম গোপন করার গুনাহের ভয়ে নিজের মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি মানুষের কাছে বর্ণনা করে গিয়েছেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ ১২ ও ১৩ নং হাদীসের প্রাথমিক অবতরণিকা দেখে মনে হয় যে, উভয়টির সম্পর্ক একই ঘটনার সাথে। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথম হাদীসে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণের জন্য "আল্লাহ্র এবাদত ও শিরক বর্জনের" শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় হাদীসে এ অর্থ বুঝানোর জন্য "তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান" কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এ কথার সমর্থন এর দ্বারাও পাওয়া যায় যে, এ সুসংবাদ সম্পর্কিত তৃতীয় আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত মো'আয (রাঃ) তওহীদের সাথে নামায এবং রোযার কথাও উল্লেখ করেছেন। এ তৃতীয় রেওয়ায়াতটি মুসনাদে আহমাদের বরাতে মেশকাত শরীফে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার শব্দমালা নিম্নরূপ ঃ যে ব্যক্তি শিরক থেকে পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে ও রমযানের রোযা রাখবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া

হবে। মো'আয বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকদেরকে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দেব না ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাদেরকে আরো আমল করতে দাও।

এ তিনটি রেওয়ায়াতের শিরোনাম যদিও ভিন্ন এবং বাহ্যিক শব্দমালায় কোনটি সংক্ষিপ্ত ও কোনটি কিছুটা বিস্তারিত হওয়ার কারণে অভিন্নতা বুঝা যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি রেওয়ায়াতের মর্ম এটাই যে, যে কেউ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে, (যার মৌলিক বিধানাবলী হচ্ছে শিরক বর্জন করা, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান করা ও নামায-রোযা ইত্যাদি পালন করা,) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার নাজাত ও মুক্তির চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

অতএব, যেসব লোক এ ধরনের হাদীস দ্বারা এই ফল আবিষ্কার করে যে, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান ও শিরক থেকে বেঁচে থাকার পর মানুষ যতই মন্দ আকীদা ও মন্দ আমলের অধিকারীই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় সে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শও করতে পারবে না, তারা আসলে এই সুসংবাদ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম ও আবেদন বুঝতেই সক্ষম হয়নি। তাছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ের যে শত শত হাদীস এমনকি কুরআনের অনেক আয়াতও তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার স্পষ্ট বিপরীত, তারা সেগুলো থেকেও চোখ বন্ধ করে রয়েছে।

(١٤) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (رواه احمد)

১৪। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কথার সাক্ষ্যপ্রদান হচ্ছে জান্নাতের চাবি। —মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও কেবল তওহীদের সাক্ষ্য প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এর অর্থও ঈমানী দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং ইসলামকে নিজের দ্বীন হিসাবে বরণ করে নেওয়া। এ বাচনভঙ্গিটি ঠিক সেইরূপ, যেমন আমাদের বাকপদ্ধতিতে 'কালেমা পড়ে নেওয়াকে' ইসলাম গ্রহণ করার অর্থে প্রয়োগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ হাদীসগুলো বলেছিলেন, তখনকার সময়ে মুসলমান এবং অমুসলিম, কাফের, মুশরিকরাও তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়াই বুঝত।

(١٥) عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَ هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَ قَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذَالِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ، قَالَ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ، قُلْتُ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ، قَالَ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ، قُلْتُ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ، قَالَ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِيْ ذَرٍّ * (رواه البخارى و مسلم)

১৫। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি এ সময় সাদা কাপড় গায়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। একটু পরে আমি আবার হাজির হলাম, তখন তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গিয়েছিলেন, এ সময় তিনি বললেন ঃ যে কোন বান্দা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে এবং এ বিশ্বাসের উপরই তার মৃত্যু এসে যায়, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। আবূ যর বলেন, আমি নিবেদন করলাম, সে যদি ব্যভিচারও করে থাকে, সে যদি চুরিও করে থাকে ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, সে যদি ব্যভিচারও করে থাকে, সে যদি চুরিও করে থাকে। আবূ যর বলেন, আমি আবার নিবেদন করলাম, সে যদি ব্যভিচারও করে থাকে, সে যদি চুরিও করে থাকে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, সে যদি ব্যভিচারও করে থাকে, সে যদি চুরিও করে থাকে। আবূ যর বলেন, আমি আবার আরয করলাম, সে যদি ব্যভিচারও করে থাকে, সে যদি চুরিও করে থাকে ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন ঃ হ্যাঁ, আবূ যরের কাছে খারাপ লাগলেও সে জান্নাতে যাবে যদিও সে ব্যভিচার করে থাকে, যদিও সে চুরি করে থাকে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ দ্বীনে তওহীদ তথা ইসলামের উপর ঈমান আনা এবং জীবনে এটাকেই অবলম্বন করে থাকা। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি দ্বীনে তওহীদের উপর আন্তরিকভাবে ঈমান রাখবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। এখন সে যদি ঈমান সত্ত্বেও কিছু গুনাহ করে ফেলে থাকে, তাহলে সে যদি কোন কারণে ক্ষমা লাভের অধিকারী হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দিয়ে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়েই তাকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন। আর যদি সে ক্ষমার যোগ্য না হয়, তাহলে গুনাহর শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে যেতে পারবে। যা হোক, ইসলামের প্রতি আন্তরিকভাবে ঈমান পোষণকারী প্রত্যেকটি মানুষ জান্নাতে অবশ্যই যাবে, যদিও জাহান্নামে গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পরেই যাক না কেন। হযরত আবূ যর (রাঃ)-এর এই হাদীসের মর্ম ও শিক্ষণীয় বিষয় এটাই।

হযরত আবূ যর (রাঃ) যে বার বার প্রশ্ন করছিলেন যে, ব্যভিচার এবং চুরি করলেও কি মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে ? এর কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, চুরি এবং ব্যভিচারকে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অপবিত্র গুনাহ মনে করার কারণে তিনি আশ্চর্যবোধ করছিলেন যে, এমন গুনাহ করেও মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে!

(١٦) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ * (رواه مسلم)

১৬। হযরত ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা গেল যে, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, সে জান্নাতে যাবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর উপর বিশ্বাস রাখার অর্থ ঐ দ্বীনে তওহীদের উপর ঈমান রাখা। আর জান্নাতে প্রবেশের অর্থও ওটাই, যা উপরে উল্লেখ করা

হয়েছে যে, আমলনামার দাবী অনুযায়ী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রথমেই (অর্থাৎ, বিনা শাস্তিতেই) অথবা গুনাহের কিছুটা শাস্তি ভোগ করার পর প্রত্যেক ঈমানদার জান্নাতে অবশ্যই যাবে।

(١٧) عَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ (وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْاَنْصَارِ) اَنَّهٗ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَ اَنَا اُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْاَمْطَارُ سَالَ الْوَادِىْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَهُمْ لَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اٰتِىَ مَسْجِدَهُمْ فَاُصَلِّىَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَاْتِيْنِىْ فَتُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ فَاَتَّخِذُهٗ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ عُتْبَانُ فَغَدَا عَلَىَّ وَ اَبُوْبَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَاْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَذِنْتُ لَهٗ فَلَمْ يَجْلِسْ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاَشَرْتُ لَهٗ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلٰى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهٗ قَالَ فَثَابَ فِى الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ اَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْعَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ اَوْ ابْنُ الدُّخْشُنِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَالِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ ذَاكَ اَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّا نَرٰى وَجْهَهٗ وَ نَصِيْحَتَهٗ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ * (رواه البخارى و مسلم)

১৭। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনছারী সাহাবী হযরত ওতবান ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে। এদিকে আমি আমার কওমের ইমামত করি; কিন্তু বৃষ্টিপাত হলে আমার ও আমার কওমের মাঝখানে যে খালটি রয়েছে সেটি পানিতে উপচে পড়ে বইতে শুরু করে, আর আমি তখন তাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়াতে পারি না। তাই ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একান্ত বাসনা যে, আপনি আমার বাড়ীতে এসে নামায পড়ে যাবেন, আর আমি সেই স্থানটিকে নামাযের স্থান হিসাবে নির্ধারিত করে নেব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ, আমি তাই করব। বর্ণনাকারী ওতবান (রাঃ) বলেন, সকাল বেলা যখন সূর্য একটু উপরে উঠল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর (রাঃ) আমার এখানে পৌঁছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে আসার অনুমতি চাইলে আমি অনুমতি দিলাম। তিনি ঘরে এসে না বসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার ঘরের কোন্ অংশটি আমার নামায পড়ার জন্য তুমি পছন্দ

কর ? আমি তখন ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করলাম। সাথে সাথে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করে দিলেন। আমরাও কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দুই রাকআত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। ওতবান (রাঃ) বলেন, এরপর আমরা তাঁকে 'খাযীরা' (এক জাতীয় সুস্বাদু খাবার) আহার করার জন্য আটকিয়ে ফেললাম, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছিলাম।

এদিকে তাঁর আগমনবার্তা শুনে মহল্লাবাসীদের মধ্য থেকেও কিছু লোক এসে সমবেত হল। তাদের মধ্য থেকেই একজন বলে উঠল, মালেক ইবনে দুখাইশিন (অথবা দুখশুন) কোথায় ? এ কথা শুনে তাদের মধ্য থেকেই অন্য একজন বলে ফেলল, সে তো মুনাফেক, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি তার ভালবাসাই নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথোপকথন শুনে বললেন ঃ এমন কথা বলো না। তুমি কি দেখছ না যে, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েছে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই লাভ করতে চায়। মন্তব্যকারী লোকটি তখন বলল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তবে আমরা তার মনোযোগ ও কল্যাণকামিতা মুনাফেকদের প্রতিই দেখি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আন্তরিকভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসেও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠকারীর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেওয়ার মর্ম উহাই, যা ইতিপূর্বেকার এ বিষয় সংক্রান্ত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। মুসলিম শরীফে এই হাদীসেই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র স্থলে 'তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদান' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। তবে উভয় শিরোনামের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেওয়া এবং দ্বীন হিসাবে ইসলামকেই বরণ করে নেওয়া। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, নবীযুগে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামকেই দ্বীন হিসাবে অবলম্বন করে নেওয়ার জন্য সাধারণভাবে এ ভাষাই প্রয়োগ করা হত।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, যে সাহাবী মালেক ইবনে দুখশুনকে মুনাফেক বলেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিতেও মালেক ইবনে দুখশুনের মধ্যে মুনাফেক হওয়ার মত কোন পাপাচার ছিল না। তার মধ্যে কেবল এই কারণটিই খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল যে, তিনি মুনাফেকদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন ও মেলামেশা করতেন।

এর দ্বারা একদিকে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী আবেগানুভূতির পরিমাপ করা যায় যে, তাঁরা এমন সামান্য ব্যাপারেও এতটুকু ক্ষুব্ধ হতেন এবং এটাকে মুনাফেকী মনে করতেন। অপর দিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরস্কার দ্বারা এ শিক্ষা লাভ হয় যে, যাদের মধ্যে এ জাতীয় কিছুটা দুর্বলতা থাকে; কিন্তু নিজেদের ঈমান এবং তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানে যদি তারা নিষ্ঠাবান হয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে এই ধরনের কুধারণা পোষণ ও এমন কঠোর মন্তব্য করা জায়েয নয়; বরং এখানে ঈমানের দিকটাই অধিক লক্ষণীয় ও সম্মানযোগ্য বিবেচিত হবে।

এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মালেক ইবনে দুখশুনও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা ইসলামের জন্য পরিচালিত সাধারণ যুদ্ধসমূহে এমনকি বদরযুদ্ধে শরীক ছিলেন। তাই এখানে মুনাফেকীর কুধারণার কোন অবকাশ নেই; বরং মুনাফেকদের সাথে সম্পর্ক রাখার পেছনে তাঁরও হয়ত হাতেব ইবনে আবী বালতা'আর মত বিশেষ কোন অপারগতা ছিল।

(١٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ فِىْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَاَبْطَأَ عَلَيْنَا وَ خَشِيْنَا اَنْ يُّقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَ فَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ اَبْتَغِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتَيْتُ حَائِطًا لِلْاَنْصَارِ لِبَنِى النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهٖ هَلْ اَجِدُ لَهٗ بَابًا فَلَمْ اَجِدْ فَاِذَا رَبِيْعٌ يَدْخُلُ فِىْ جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ (والرَّبِيْعُ الْجَدْوَلُ) قَالَ فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ مَا شَانُكَ ؟ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَاَبْطَاْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا اَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَاَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِىْ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَعْطَانِىْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَىَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيْكَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ، فَقَالَ مَاهَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِىْ بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ بَشَّرْتُهٗ بِالْجَنَّةِ، فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِىْ فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكِبَنِىْ عُمَرُ وَاِذَا هُوَ عَلٰى اِثْرِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهٗ بِالَّذِىْ بَعَثْتَنِىْ بِهٖ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِىْ فَقَالَ ارْجِعْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَ اُمِّىْ اَبَعَثْتَ اَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ بَشَّرَهٗ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَاِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ يَّتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ

* (رواه مسلم)

১৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বসা ছিলাম।

হযরত আবূ বকর এবং ওমর (রাঃ)ও আমাদের সাথে ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখান হতে উঠে কোন এক দিকে চলে গেলেন। তারপর তাঁর ফিরে আসতে অনেক দেরী হচ্ছিল বলে আমরা শংকিত হয়ে পড়লাম যে, আমাদেরকে ছেড়ে গিয়ে একাকী অবস্থায় তিনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হলেন কি না। (অর্থাৎ, আমাদের অবর্তমানে তিনি কোন শত্রুর অনিষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন কি না।) এ চিন্তায় আমরা অস্থির হয়ে গেলাম এবং সবাই তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। সবার আগে আমিই অস্থির হয়ে তাঁর সন্ধানে বের হয়ে পড়লাম। খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত আনসারদের বনূ নাজ্জার গোত্রের এক বাগানে এসে পৌঁছলাম। বাগানটি চার দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। আমি এখানে এসে চারদিকে ঘুরতে লাগলাম যে, ভিতরে যাওয়ার জন্য কোন রাস্তা পাই কি না। কিন্তু কোন রাস্তা খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ দেখলাম, ছোট্ট একটি নালা, যা বাইরের একটি কুঁয়া থেকে বাগানের ভিতর প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। (আবূ হুরায়রা বলেন,) আমি নিজেকে সঙ্কুচিত করে এই সরু নালা দিয়ে বাগানের ভিতর পৌঁছে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির হলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন ঃ আবূ হুরায়রা ? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ কিভাবে এখানে আসা হল ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের মাঝে ছিলেন, হঠাৎ করে সেখান থেকে উঠে আসলেন। তারপর যখন দেখলাম আপনার ফিরতে দেরী হচ্ছে, তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের থেকে পৃথক হয়ে একাকী আপনি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে গেলেন কি না। এই আশংকায় আমরা সবাই ঘাবড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর সবার আগে আমিই শংকিত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি এ বাগানে এসে পৌঁছলাম, আর (ভিতরে প্রবেশের জন্য যখন কোন দরজা খুঁজে পেলাম না, তখন) শিয়ালের মত শরীর কুঁচকে এই সরু পথেই কোন রকমে এখানে ঢুকে পড়লাম। অন্যান্য লোকেরাও আমার পেছনে রয়েছে। এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পাদুকাদ্বয় আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ আমার এই জুতা দু'টি নিয়ে যাও এবং এ বাগান থেকে বের হবার পর এমন যে ব্যক্তির সাথেই তোমার সাক্ষাত হয়, যে আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য দেয়, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সেখান থেকে বের হয়ে সামনে রওয়ানা দিলাম। সর্বপ্রথম যার সাথে আমার সাক্ষাত হল তিনি ছিলেন হযরত ওমর। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ হুরায়রা! তোমার হাতে এ পাদুকাদ্বয়ের রহস্য কি ? আমি উত্তর দিলাম, এ দু'টি হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা মুবারক। আমাকে তিনি এগুলো দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, এমন যার সাথেই আমার সাক্ষাত হয়, যে আন্তরিকভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য প্রদান করে, আমি যেন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেই। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এই কথা শুনে ওমর (রাঃ) আমার বুকে হাত দ্বারা এমন জোরে আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর তিনি বললেন, পিছনের দিকে ফিরে যাও। আমি কাঁদতে কাঁদতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে আসলাম, আর ওমরও পেছনে পেছনে এসে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আবূ হুরায়রা! তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম, ওমর (রাঃ)-এর সাথে আমার

সাক্ষাত হল। আপনি আমাকে যে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন আমি তাঁকে সেই সুসংবাদ শুনালাম. তখন তিনি আমার বুকের উপর এমন আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। আর তিনি আমাকে এও বললেন যে, পেছনে ফিরে যাও। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ওমরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ওমর! তুমি এমনটি কেন করলে ? ওমর নিবেদন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোন। আপনি কি আবূ হুরায়রাকে আপনার পাদুকাদ্বয় দিয়ে এ জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, সে এমন যার সাথেই সাক্ষাত করবে, যে আন্তরিকভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য দান করে, তাকেই যেন জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেয় ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিই তাকে একথা বলে পাঠিয়েছিলাম। ওমর বললেন, দয়া করে আপনি এরূপ করবেন না। কেননা, আমার আশংকা হয় যে, মানুষ একথা শুনে এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে (এবং আমল ও সাধনা থেকে উদাসীন হয়ে যাবে।) তাই তাদেরকে এভাবে আরো আমল করতে দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ আচ্ছা, তাদেরকে আমল করার জন্য ছেড়ে দাও। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যার দাবী রাখে ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ক্ষেত্রে হযরত আবূ হুরায়রাকে নিজের পাদুকাদ্বয় কেন দিলেন ? হাদীস ব্যখ্যাতাগণ এর ব্যাখ্যায় যদিও বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু এসবের মধ্যে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ এই মনে হয় যে, হযরত আবূ হুরায়রাকে তিনি যে মহা সুসংবাদের ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, এর সবিশেষ গুরুত্বের কারণে নিজের কোন বিশেষ স্মারকচিহ্ন তাঁর সাথে দেওয়া উপযোগী মনে করলেন। আর সে সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার মত অন্য কোন জিনিস ছিল না। তাই তিনি নিজের পাদুকাদ্বয়ই আবূ হুরায়রার হাতে দিয়ে দিলেন।

(২) হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনায় হযরত আবূ হুরায়রার সাথে যে কঠোর ব্যবহার করলেন, এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য হযরত ওমরের ঐ বিশেষ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যা তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি (এবং হযরত আবূ বকরও) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কর্মকান্ডে অংশীদার তথ্যাভিজ্ঞ, বিশেষ উপদেষ্টা এবং বলতে গেলে তাঁর মন্ত্রী ও সহকারীর পর্যায়ে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও সাধারণভাবে তাঁর এ মর্যাদা ও অবস্থানের কথা জানতেন। আর যেভাবে প্রত্যেক দলের ও প্রত্যেক পরিবারের প্রধান ব্যক্তিটি তার ছোটদেরকে শাসন ও তিরস্কারের অধিকার সংরক্ষণ করে, এখানে হযরত ওমরও সে অধিকার রাখতেন। তিনি অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন বশতঃ এ অধিকার প্রয়োগও করতেন। বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, ছোটদের সংশোধন ও তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বড়দের এই অধিকার মেনে নিতে হয়। তাই হযরত ওমর (রাঃ) এ ঘটনায় আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে যে কঠোর আচরণ করেছেন, এটা এ ধরনের ব্যাপারই ছিল। আর এমনটাও বুঝা যায় যে, হযরত ওমর প্রথমে হয়তো তাঁকে ফিরে যেতে বলেছিলেন; কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা যেহেতু সকল ঈমানদারদের জন্য একটি মহা সুসংবাদ নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এটাকে নিজের জন্য তিনি বিরাট সৌভাগ্য মনে করছিলেন, তাই তিনি ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। শেষে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করার জন্য এ

কঠোর ব্যবহার ও বলপ্রয়োগ করলেন। কেননা, নবুওয়াতের পদমর্যাদা ও নবীর বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকার দরুন তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এই ব্যাপক সুসংবাদের ক্ষতিকর দিকটি যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আসবে, তখন তিনিও এটাকে অনুপযোগীই মনে করবেন এবং আবূ হুরায়রাকে এর ব্যাপক প্রচার থেকে নিষেধ করে দেবেন। বস্তুতঃ শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল।

এখানে এ কথাটিও স্মরণ রাখা চাই যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মো'আয (রাঃ)-কেও এমন সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। (এ হাদীসটি ১৩নং ক্রমিকে ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।) তখন মো'আয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন যে, আমি এ সুসংবাদটি সকল মুসলমানকে শুনিয়ে দেই; কিন্তু তিনি এর অনুমতি দিলেন না। অনুমতি না দেওয়ার কারণ হিসাবে তিনি একথাই বলেছিলেন যে, মানুষ একথা শুনে এর উপরেই ভরসা করতে থাকবে এবং দ্বীনী উন্নতি থেকে পেছনে পড়ে যাবে।

(৩) এই হাদীসেও কেবল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দানের উপর জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এর একটি সাধারণ ব্যাখ্যা তো তাই, যা উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এ হাদীসের শব্দমালায় এই সম্ভাবনারও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর অর্থ শুধু এই যে, যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র সাক্ষ্য দান করবে অর্থাৎ খাঁটি অন্তরে দ্বীনে তওহীদ তথা ইসলামকে গ্রহণ করে নেবে, তাকে অবশ্যই এ সুসংবাদ দেওয়া হবে যে, সে নিশ্চয় জান্নাতে যাবে, যদিও গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পরই যাক না কেন। এ অর্থ গ্রহণ করলে কোন প্রশ্ন থাকে না।

এতদ্ভিন্ন এখানে আরেকটি সূক্ষ্মতত্ত্ব উল্লেখ করার মত রয়েছে যে, মহান আল্লাহ্র দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের উপর অনেক সময় আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা, তাঁর অনন্ত মহিমা, তাঁর ক্রোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষমতার বিষয়টি যখন ফুটে উঠে, তখন তাঁদের উপর আতংক ও ভীতির ভাব প্রবল হয়ে উঠে। এ সময় তাদের অনুভূতি এই থাকে যে, হয় তো কোন নাফরমান বান্দাই আর মুক্তি পেতে পারবে না। আর এ বিশেষ অবস্থায় তাদের বক্তব্য এমন হয়ে থাকে যে, যে ব্যক্তি এ পাপে লিপ্ত হবে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না, যে ব্যক্তি এই গুনাহ করবে, জান্নাতের বাতাসও তার গায়ে লাগবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অন্য কোন সময় যখন তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম দয়া ও রহ্মত এবং তাঁর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও অনুকম্পার বিষয়টি উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন তাদের উপর আশা এবং আল্লাহ্র রহমতের দিকটি প্রবল হয়ে যায় এবং এ জগতে তাদের হৃদয়ানুভূতি এই হয়ে থাকে যে, যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণও কল্যাণের বস্তু আছে, তাকে ক্ষমাই করে দেওয়া হবে। আর এ ধরনের অবস্থাতেই তাদের মন থেকে এ প্রকার সুসংবাদবাণী বের হয়ে থাকে। এ সূক্ষ্মতত্ত্বটিই শেখ সাদী সিরাজী (রহঃ) এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ আল্লাহ্র শান তো হচ্ছে এই যে, তিনি যদি প্রবল প্রতাপের সাথে তাঁর নির্দেশের তরবারী চালিয়ে দেন, তাহলে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও নির্বাক ও বধির হয়ে থাকবে। আর যদি নিজের অনুগ্রহ বিতরণের ঘোষণা দিয়ে দেন, তাহলে আযাযীল শয়তানও আশান্বিত হয়ে বলে উঠবে যে, হয়ত আমিও এ করুণার একটি অংশ পেয়ে যাব।

অতএব, উপরে উল্লেখিত হাদীসের ব্যাপারে এটাও খুবই যুক্তিযুক্ত যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) যখন বনূ নাজ্জারের ঐ বাগানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমতের দরিয়া ও তাঁর অপার অনুগ্রহের দ্যুতির কল্পনা ও পর্যবেক্ষণে নিমগ্ন ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি হযরত আবূ হুরায়রাকে প্রমাণ হিসাবে নিজের পাদুকা মুবারক দিয়ে তওহীদের সাক্ষ্য দানকারী প্রতিটি মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) যেহেতু এই বিষয়টির স্বরূপ এবং এসব অবস্থার উৎরাই চড়াই সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাই তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা ও তদন্ত না করা পর্যন্ত আবূ হুরায়রাকে বিষয়টির ঘোষণা দিতে বারণ করে থাকবেন। অন্যরূপে কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, এ সময় হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের এ বিশেষ ভাব (অর্থাৎ, দয়া ও আশার প্রাবল্য) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উদঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি নিজের ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এ কথা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন যে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এ অবস্থার প্রাবল্য থাকবে না এবং এ ঘোষণার অন্য দিকটি যখন তাঁর সামনে তুলে ধরা হবে, তখন তিনি নিজেই এটা নিষেধ করে দেবেন। যেমন, বাস্তবে তাই হয়েছিল। এ ধরনের নাজুক ক্ষেত্রে সঠিক বিষয়ের উপলব্ধি ও বাস্তবতার অনুধাবন হযরত ওমর (রাঃ)-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। হাদীস শরীফে এ বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত ওমরকে 'মুহাদ্দাস' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আরেকটি মৌলিক কথা, যার দ্বারা এ ধরনের অনেক হাদীসে উত্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তির নিরসন হয়ে যায়

এই ধরনের আয়াত ও হাদীসের উপর চিন্তা-গবেষণা করার সময় একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে এটাও মনে রাখার মত যে, এই ধরনের সুসংবাদে বক্তার উদ্দেশ্য ও দৃষ্টি থাকে কোন ভাল কাজের নিজস্ব গুণ এবং তার প্রকৃত প্রভাব ও ফলাফল বাতলে দেওয়া। সেখানে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না যে, অন্য কোন কাজের দাবী যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে পরে পরিণাম কি হবে। আর এটা ঠিক এমনই, যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তকসমূহে এ নীতির ভিত্তিতেই ঔষধের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেমন, লেখা থাকে, যে ব্যক্তি ত্রিফলা ব্যবহার করবে সে সর্বদা সর্দি থেকে নিরাপদ থাকবে। এর দ্বারা কেউ যদি এ কথা বুঝে নেয় যে, কেউ যদি ত্রিফলা খাওয়ার সাথে সাথে চর্বি, টক ইত্যাদি সর্দি উৎপাদক জিনিসগুলোও সব সময় খেতে থাকে, তাহলেও তার কখনো সর্দি হবে না, তবে এটা চরম নির্বুদ্ধিতা ও চিকিৎসকদের কথার মর্ম উপলব্ধি না করারই প্রমাণ হবে।

এ মূলনীতির আলোকে এই ধরনের হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকুই যে, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানের নিজস্ব দাবী এটাই যে, এর দ্বারা মানুষ জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং জান্নাতে যাবে। কিন্তু সে যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন কিছু খারাপ আমলও করে থাকে, যেগুলোর নিজস্ব দাবী শাস্তি পাওয়া এবং জাহান্নামে যাওয়া বলে কুরআনে বলা হয়েছে, তাহলে এগুলোও তার নিজস্ব কিছু না কিছু প্রভাব দেখিয়েই ছাড়বে। এই ছোট তত্ত্ব কথাটি স্মরণে রাখলে সুসংবাদ ও সতর্কবাণী এবং উৎসাহদান ও ভয় প্রদর্শন সম্পর্কীয় শত শত হাদীসের বেলায় মানুষের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি এবং এর কারণে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়, ইনশাআল্লাহ তা আর থাকবে না।

(١٩) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً *

(رواه البخارى و مسلم واللفظ له)

১৯। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নাম থেকে ঐ ধরনের সকল মানুষকেই বের করে আনা হবে, যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছিল এবং তাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ পুণ্যও ছিল। তারপর ঐ সব লোকদেরকেও বের করে আনা হবে, যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছিল এবং তাদের অন্তরে গমের দানার সমান পুণ্যও ছিল। তারপর ঐসব লোকেদেরকেও বের করে আনা হবে, যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে ছিল এবং তাদের অন্তরে অণু পরিমাণ পুণ্যও ছিল। —বুখারী, মুসলিম

পূর্বে উল্লেখিত অনেক হাদীসের ব্যাখ্যায় যেমন বিস্তারিতভাবে এবং প্রামাণ্যরূপে লিখা হয়েছে, তেমনিভাবে এ হাদীসেও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা দ্বারা ইসলাম কবূল করা এবং এর স্বীকৃতি প্রদান করাই উদ্দেশ্য। এর ভিত্তিতে হাদীসের মর্ম এটাই হয় যে, যেসব মানুষ ইসলামের কালেমা পাঠ করে এবং নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত রাখে, আর তাদের অন্তরে অণু পরিমাণ পুণ্য (অর্থাৎ, ঈমানের আলো) থাকে, তারাও শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসবে। এ হাদীসে তিনটি স্থানে 'খায়র' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অনুবাদ আমরা 'পুণ্য' শব্দ দিয়ে করেছি। কিন্তু হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসেরই অন্য এক রেওয়ায়তে (যেটি ইমাম বুখারীও উল্লেখ করেছেন) 'খায়র' শব্দের স্থলে 'ঈমান' শব্দও এসেছে, যা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, এখানে পুণ্য দ্বারা ঈমানের আলোই উদ্দেশ্য।

এ হাদীস দ্বারা হকপন্থীদের দু'টি বিশেষ ও সর্বসম্মত এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ আকীদার কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায়। প্রথম বিষয়টি এই যে, অনেক কালেমা পাঠকারী লোক নিজেদের বদ আমলের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, তাদের অন্তরে যদি হাল্কা এবং দুর্বল এমনকি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী অণু পরিমাণ ঈমানও থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। এটা হতে পারে না যে, কোন অতি নিম্ন স্তরের ঈমানদারও কাফের মুশরিকদের মত চিরকাল জাহান্নামে পড়ে থাকবে, তারা আমলের বিবেচনায় যত বড় ফাসেক ও পাপাচারীই হোক না কেন।

এ বিষয়ের অনেক হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফেই হযরত আনাস (রাঃ) ছাড়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী, হযরত জাবের এবং হযরত আবূ হুরায়রা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এ বিষয়বস্তুটি উল্লেখিত সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া হযরত আবূ বকর, হযরত আবূ মূসা প্রমুখ অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যা হোক, হাদীস বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং উলূমুল হাদীসে পারদর্শী লোকদের নিকট এ বিষয়টি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সন্দেহাতীত ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত; বরং বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর যে বিস্তারিত বর্ণনাটি পাওয়া যায়, সেখানে স্পষ্টভাবে এ কথারও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যেসব

পাপী মুসলমান জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত মুমিনরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে খুবই অনুনয় বিনয়ের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রার্থনা জানাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই অনুরোধ ও প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাদেরকেই অনুমতি দিয়ে বলবেন ঃ যাও, তোমরা যার মধ্যে এক দীনার পরিমাণও কল্যাণ দেখ তাকেই বের করে নিয়ে আস। ফলে এ ধরনের প্রচুর সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে। তারপর আবার তাদেরকে বলা হবে, এবার গিয়ে দেখ, যাদের মধ্যে অর্ধ দীনার কল্যাণেরও সন্ধান পাও তাদেকেও বের করে নিয়ে আস। এর ফলে এ ধরনের প্রচুর সংখ্যক লোককে বের করে নিয়ে আসা হবে। তারপর আবার হুকুম হবে যে, যাও, এমন লোকদেরকেও বের করে নিয়ে আস, যাদের মধ্যে অণু পরিমাণ কল্যাণও তোমরা দেখতে পাও। এর ফলে এমন স্তরের অনেক লোককে বের করে আনা হবে। পরিশেষে এই সুপারিশকারীরাই নিবেদন করবে ঃ হে প্রতিপালক! আমরা জাহান্নামে এমন কাউকে আর ছেড়ে আসিনি, যার অন্তরে কিছুটা কল্যাণ (তথা ঈমানের নূর) আছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ ফেরেশতারাও সুপারিশ করেছে, নবীরাও সুপারিশ করেছে এবং মুমিনরাও সুপারিশ করেছে। এখন কেবল পরম দয়াময় (আল্লাহ্ তা'আলা)-এর পালাই অবশিষ্ট। এই বলে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহ্মত ও ক্ষমার হাতে এমন লোকদেরকেও বের করে নিয়ে আসবেন, যারা কখনো কোন নেক আমলই করেনি। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর এ হাদীসের শেষে ঐসব লোকদের ব্যাপারে একথাটিও রয়েছে ঃ এরা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোক। আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে কোন আমল ও কল্যাণের বিনিময় ছাড়াই জান্নাতে দাখিল করবেন।

এরা হবে ঐসব লোক, যাদের কাছে খুবই দুর্বল ও ক্ষীণ ঈমান ছাড়া নেক আমল ও পুণ্যের কোন পুঁজিই থাকবে না; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শেষ পর্যন্ত নিজ দয়া ও অনুগ্রহে তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করে দিবেন।

এ মাসআলা ও প্রসঙ্গটি নিয়ে ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে 'মুরজিয়া' এবং 'খারেজী' উভয় সম্প্রদায় বিভ্রান্তিতে পড়ে গিয়েছিল। (মুরজিয়ারা বলত, মুমিন হওয়ার জন্য কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট, আমলের কোন প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে খারেজীরা বলত যে, আমল ছেড়ে দিলে মানুষ মুমিনই থাকে না; বরং কাফের হয়ে যায়।) বর্তমানেও কোন কোন মহলের প্রবণতা মুরজিয়াদের মত মনে হয়, আবার অন্য মহলের ঝোঁক খারেজীদের মতবাদের প্রতি লক্ষ্য করা যায়। এই জন্যই আমরা হাদীসের মূল ব্যাখ্যার বাইরে এ কয়টি লাইন লিখা জরুরী মনে করেছি।

ইসলাম গ্রহণের দ্বারা অতীতের সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়

(٢٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ فِيْ قَلْبِيْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلَاُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهٗ فَقَبَضْتُ يَدِيْ فَقَالَ مَالَكَ يَا عَمْرُو قُلْتُ اَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ قُلْتُ اَنْ يُّغْفَرَلِيْ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ وَاَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَ اَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهٗ * (رواه مسلم)

২০। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলাম, আপনার ডান হাতটি বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করব। তিনি তখন নিজের ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলেন; কিন্তু আমি আমার হাত ফিরিয়ে নিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আমর! তোমার কি হল ? (অর্থাৎ, তুমি তোমার হাত কেন ফিরিয়ে নিলে ?) আমি নিবেদন করলাম, আমি একটি শর্ত লাগাতে চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি কি শর্ত আরোপ করতে চাও ? আমি আরয করলাম, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ হে আমর! তোমার কি একথা জানা নেই যে, ইসলামগ্রহণ পূর্ববর্তী সকল গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়, হিজরতও পূর্ববর্তী গুনাহসমূহকে শেষ করে দেয় এবং হজ্জও পূর্ববর্তী গুনাহসমূহকে দূর করে দেয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহমাফীর ক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়া হিজরত এবং হজ্জের প্রভাবের কথা এই স্থানে এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলেছেন যে, ইসলাম তো ইসলামই; এর কোন কোন আমলের মধ্যেও গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেওয়ার শক্তি রয়েছে। তবে এখানে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ (১) ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরত অথবা হজ্জ করার এই প্রভাব ঐ অবস্থায় প্রতিফলিত হবে, যখন এ কাজগুলো খাঁটি নিয়্যতে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হবে। (২) শরীঅতের দলীল-প্রমাণ দ্বারা এ কথা স্বস্থানে স্বীকৃত যে, কারো জিম্মায় যদি আল্লাহ্র বান্দাদের কোন হক থাকে, বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত হক থাকে, তাহলে ইসলাম গ্রহণ অথবা হিজরত কিংবা হজ্জের দ্বারা এ হক মাফ হবে না। এ ব্যাপারটি পাওনাদারদের নিকট থেকে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

কুফর ও শিরকের জীবন থেকে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলে যে অতীতের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, এর প্রতিশ্রুতি কুরআন শরীফেও দেওয়া আছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ হে রাসূল! আপনি ঐসব লোকদের বলে দিন, যারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, তারা যদি (কুফরী থেকে) ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সূরা আনফাল)

(٢١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلَامُهٗ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَالِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلَّا اَنْ يَّتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا * (رواه البخارى)

২১। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং তার এই ইসলাম সুন্দর হয়, তখন ইতিপূর্বে সে যেসব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম গ্রহণের বরকতে সেগুলো ক্ষমা করে দেন। তারপর তার ভাল-মন্দের হিসাব এই থাকে যে, একটি পুণ্যের উপর দশ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত সওয়াব লিখা হয়, আর মন্দ কাজ করলে সে

কেবল ঐ একটি মন্দ কাজের শাস্তির উপযুক্ত হয়। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যদি এটাও ক্ষমা করে দেন (তাহলে দিতে পারেন।)। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্র দ্বীন (ইসলাম)কে নিজের দ্বীন বানিয়ে নিলে এবং মুসলমান হয়ে গেলে যে অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়, এর জন্য শর্ত হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্যও যেন তার জীবনে এসে যায়। (অর্থাৎ, তার অন্তর ও অভ্যন্তর ইসলামের আলোতে আলোকিত এবং দেহ ও কাঠামো আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও গোলামীতে যেন সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে যায়।) হাদীসে উল্লেখিত "তার ইসলাম যদি সুন্দর হয়ে যায়" কথার মর্ম এটাই।

অতএব, কারো জীবন যদি ইসলাম গ্রহণের পরও ইসলামের আলো ও সৌন্দর্য থেকে শূন্য থেকে যায় এবং তার অন্তর ও বাহিরে ইসলামের রূপ প্রতিফলিত না হয়, তাহলে পেছনের সকল গুনাহ মাফীর ঘোষণা তার বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

অনুরূপভাবে একথাও এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, একটি পুণ্যের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শ' গুণ পর্যন্ত প্রদানের পুরস্কারমূলক বিধানটিও ঐসব বান্দাদের জন্য যারা ইসলামের কিছুটা শোভা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে নিতে পেরেছে। আর এই শোভা ও সৌন্দর্যের কমবেশীর হিসাবেই পুণ্যের প্রতিদানও দশগুণ থেকে সাত শ' গুণ পর্যন্ত উঠানামা করে।

ঈমান গ্রহণ করার পর মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যায়

(٢٢) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهٗ وَ نَفْسَهٗ اِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ * (رواه البخارى ومسلم)

২২। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এ বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখব, যে পর্যন্ত না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে। তারপর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলল, সে নিজের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করে নিল, তবে ইসলামেরই কোন আইন অনুসারে যদি (তার নিরাপত্তায়) হস্তক্ষেপ করতে হয়। আর তার হিসাব-নিকাশের ভার আল্লাহ্ তা'আলার উপর। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কয়েকটি গোত্র যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিয়ে হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক এই হাদীসটি বর্ণিত হয়।

এ হাদীসেও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার অর্থ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেওয়া। পূর্বের হাদীসসমূহে যেরূপ ইসলাম গ্রহণের পরকালীন ফল জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভ উল্লেখ করা হয়েছে, তদ্রূপ এ হাদীসে ইসলাম গ্রহণের একটি পার্থিব ও আইনগত উপকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর দ্বারা মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যায়। তাছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে একটি

অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির ঘোষণা দিয়েছেন। ঘোষণাটি এই যে, আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য এ ছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্য ও বন্দেগীর পথে নিয়ে আসা হবে এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। অতএব, যে কেউ আল্লাহ্‌র দ্বীনকে গ্রহণ করে নেবে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই নির্ধারিত জীবনধারা তথা ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেবে, তার জীবন ও সম্পদ আমাদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

"তবে ইসলামেরই কোন আইনে যদি হস্তক্ষেপ করা হয়" কথাটির মর্ম এই যে, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করার পর এমন কোন অপরাধে লিপ্ত হয়, যার কারণে স্বয়ং আল্লাহ্‌র আইনেই তাকে শারীরিক অথবা আর্থিক কোন শাস্তি দিতে হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার কারণে এবং মুসলমান হওয়ার কারণে সে এই আইনগত শাস্তি ও দন্ড থেকে রেহাই পাবে না।

"তার হিসাব-নিকাশের ভার থাকবে আল্লাহ্‌র উপর" একথাটির মর্ম হল, যে ব্যক্তি ইসলামের কালেমা পাঠ করে তার ঈমান গ্রহণের বিষয়টি আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবে, আমরা তাকে মু'মিন এবং মুসলমান স্বীকার করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দেব এবং তার সাথে মু'মিন মুসলমানের মতই ব্যবহার করব, কিন্তু বাস্তবে যদি তার নিয়্যতে কোন গোলমাল থাকে এবং তার অন্তরে কোন কৃত্রিমতা থাকে, তাহলে এর হিসাব নেওয়ার ভার আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি যেহেতু আলেমুল গায়েব এবং অন্তর্যামী, তাই তিনিই তার হিসাব বুঝে নেবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি প্রায় একই শব্দমালায় মুসলিম শরীফে হযরত জাবের এবং তারেক আশজায়ী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। অপর কয়েকজন সাহাবী এ বিষয়বস্তুটি কিছুটা বিস্তারিতভাবেও বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা এ হাদীসের বিষয়বস্তুটি আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। আমরা এগুলো থেকে কয়েকটি রেওয়ায়াত এখানে উল্লেখ করছি।

(٢٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوْا بِىْ وَبِمَا جِئْتُ بِهٖ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ * (رواه مسلم)

২৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখি, যে পর্যন্ত না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য দেয় এবং আমার প্রতি এবং আমি যে হেদায়াত নিয়ে এসেছি এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেয়। অতএব, যখন তারা এমনটি করে নেবে, তখন তারা নিজেদের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করে নিতে পারবে। তবে ইসলামেরই কোন আইন ও অধিকারের কারণে যদি তা ক্ষুণ্ন হয়। আর তাদের হিসাব থাকবে আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যদান ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত ও রেসালতের উপর এবং তাঁর আনীত দ্বীনের উপর ঈমান আনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও এ বিষয়ের একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, এর আগের হাদীসে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ পূর্ণ দ্বীন-ইসলামকেই গ্রহণ করে নেওয়া।

(٢٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ * (رواه البخارى ومسلم)

২৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এ বিষয়ে নির্দেশপ্রাপ্ত যে, মানুষের সাথে আমি যেন সে পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাই, যে পর্যন্ত না তারা এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল এবং যে পর্যন্ত না তারা নামায কায়েম করতে শুরু করে ও যাকাত প্রদান করতে শুরু করে। তারপর তারা যখন এসব করতে শুরু করবে, তখন তারা নিজেদের জীবন ও সম্পদকে নিরাপদ করে নিতে পারবে, তবে ইসলামের কোন হক ও অধিকারের কারণে। আর তাদের হিসাব-নিকাশ থাকবে আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যদানের সাথে সাথে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি বিধানের উল্লেখও কেবল উদাহরণ ও লক্ষণ হিসাবে করা হয়েছে। অন্যথায় এখানেও উদ্দেশ্য এটাই যে, আল্লাহ্র দ্বীনের উপর ঈমান নিয়ে আসবে এবং ইসলামের দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেবে। এ বিষয়টি হযরত আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত উপরের হাদীসে "আমার উপর এবং আমার আনীত হেদায়াতের উপর ঈমান নিয়ে আসবে" এ সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দমালায় বুঝানো হয়েছে।

(٢٥) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا وَصَلُّوْا صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَاَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَائُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ * (رواه البخارى)

২৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এ বিষয়ে নির্দেশপ্রাপ্ত যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখি, যে পর্যন্ত না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র স্বীকৃতি দান করে। অতএব, তারা যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র প্রবক্তা হয়ে যাবে, আমাদের মতই নামায আদায় করবে, আমাদের কেবলার অনুসরণ করবে এবং আমাদের যবেহকৃত পশু খাবে, তখন তাদের শোণিত ও তাদের সম্পদ আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে, তবে ইসলামের কোন অধিকারের কারণে যদি ব্যতিক্রম হয়। আর তাদের হিসাব-নিকাশের ভার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকবে। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তওহীদের সাক্ষ্যদানের সাথে নামায পড়া, নামাযে ইসলামের কেবলার অভিমুখী হওয়া এবং মুসলমানদের যবেহকৃত পশু খাওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এ জিনিসগুলোর উল্লেখও কেবল আলামত ও নিদর্শন হিসাবেই করা হয়েছে। এ হাদীসেরও প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহের মত কেবল এতটুকুই যে, আমার যুদ্ধ যার সাথেই হোক না কেন, এটা কেবল দ্বীনের খাতিরে এবং মানুষকে কুফর ও শিরকের ভ্রষ্টতা থেকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনার জন্যই পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই যে সব লোক ভ্রান্তপথ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্ প্রদর্শিত সরল পথ অবলম্বন করে নেবে এবং সত্য দ্বীন তথা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে, তাদের জীবন ও সম্পদে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা আমাদের জন্য হারাম। যেহেতু ঐ যুগ এবং ঐ পরিবেশে ঈমান ও ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন এগুলোই ছিল যে, মানুষ মুসলমানদের পদ্ধতি অনুযায়ী নামায পড়তে শুরু করবে, নামাযে কা'বা অভিমুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং মুসলমানদের যবেহকৃত পশু খাওয়া বর্জন করবে না, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদর্শন হিসাবেই এই বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছেন।

আবূ দাউদ শরীফে এ হাদীসেরই রেওয়ায়াতে "তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত থাকবে" এর স্থলে এ শব্দমালা রয়েছে ঃ "মুসলমানদের যেসব অধিকার রয়েছে, সেসব অধিকার তাদের জন্যও সংরক্ষিত থাকবে এবং মুসলমানদের উপর যা কিছু বর্তায় তাদের উপরও তাই বর্তাবে।" যার মর্ম এই যে, যেসব লোক ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে তাদের বিরুদ্ধে কেবল আমাদের যুদ্ধাভিযান খতম হয়ে যাবে এবং তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে যাবে, তাই নয়; বরং তারা সকল অধিকার লাভে ও দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ আমাদের সমান হয়ে যাবে।

এ হাদীসসমূহের ব্যাপারে একটি সন্দেহ ও এর উত্তর

এ হাদীসসমূহের উপর স্থূল দৃষ্টিতে একটি প্রশ্ন জাগে। কোন কোন হাদীস ব্যাখ্যাতা নিজেই এ প্রশ্নটি উত্থাপন করে এর বিভিন্ন উত্তরও দিয়েছেন। প্রশ্নটি এই যে, ইসলামে 'জিযিয়া' এবং উপযুক্ত শর্তের সাথে সন্ধি-চুক্তির নীতিও স্বীকৃত এবং এ দুই পন্থায়ও যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এ হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, যুদ্ধবিরতি কেবল তখনই হতে পারে, যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নেবে।

অধম সংকলকের নিকট এর উত্তর হচ্ছে এই যে, এসব হাদীসের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু যুদ্ধ বিরতি ও যুদ্ধ খতম করে দেওয়ার পন্থা বাতলানো নয়; বরং এ সব বক্তব্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসল উদ্দেশ্য কেবল দু'টি বিষয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। প্রথম বিষয়টি এই যে, আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, মানুষ আল্লাহ্রই এবাদত করবে এবং তাঁরই নির্ধারিত সরল পথে চলবে অর্থাৎ, ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নেবে। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, যারা এই দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেবে, আমাদের পক্ষ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকবে; বরং অধিকার ও দায়িত্বের বেলায় তারা অন্যান্য মুসলমানদের সম্পূর্ণ সমান বিবেচিত হবে।

এখন জিযিয়া এবং বিশেষ অবস্থায় বিশেষ শর্তের সাথে সন্ধিচুক্তি প্রসঙ্গে আসা যাক। বস্তুতঃ এগুলো যদিও যুদ্ধবিরতির পন্থার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, এটা ইসলামী

যুদ্ধের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; বরং যেহেতু এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ, ইসলামের দাওয়াতের জন্য নিরাপদ রাস্তা খুলে যায়, তাই এর উপরও যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়ে যায়।

ঈমান ও ইসলামের কয়েকটি বাহ্যিক নিদর্শন

(٢٦) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَ ذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ * (رواه البخارى)

২৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কেউ আমাদের মত নামায পড়বে, আমাদের কেবলার অভিমুখী হবে এবং আমাদের যবেহকৃত পশুর গোশ্ত খাবে, সে-ই হবে ঐ মুসলিম যার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা রয়েছে। অতএব, তোমরা তার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করো না। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটির উদ্দেশ্য বুঝার জন্য এই বাস্তব বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে যখন ইসলামী দাওয়াত কার্যক্রম পূর্ণ শক্তি ও প্রতাপসহ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন এমন অনেক ঘটনাই সামনে আসত যে, কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে নিত, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় তাদের ব্যাপারে এ সন্দেহের অবকাশ রয়ে যেত যে, তারা হয়তো প্রকৃতভাবে এবং অন্তর দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যের সম্পর্ক কেবল এ ধরনের মানুষের সাথেই এবং তিনি এ বক্তব্য দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে এই বুঝাতে চান যে, যার মধ্যে তোমরা ইসলাম গ্রহণের এই বাহ্যিক নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষ করবে যে, ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়ে, নামাযে মুসলমানদের কেবলাকে অনুসরণ করে এবং মুসলমানদের যবেহকৃত পশুর গোশ্ত খায়, তখন তাকে মুসলমানই মনে করে নাও এবং তার জীবন ও সম্পদকে আল্লাহ্ কর্তৃক নিরাপদ মনে করে নাও। অর্থাৎ, অহেতুক এ ধরনের কুধারণার ভিত্তিতে যে, তার অন্তরে ইসলাম নেই; বরং মুনাফেকী ভাব নিয়ে সে ইসলামী প্রতীক ও নিদর্শনসমূহ অবলম্বন করে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে যেয়ো না। মোটকথা, এ হাদীসের উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া।

অতএব, কিছু লোক যে এই হাদীসের এই মর্ম আবিষ্কার করে যে, যার মধ্যে ইসলামের এই প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ থাকবে, (অর্থাৎ, নামায পড়া, কেবলা অভিমুখী হওয়া এবং মুসলমানদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া,) তার মধ্যে ইসলামবিরোধী যত বিশ্বাস ও চিন্তাধারাই থাকুক না কেন এবং সে কাফের ও মুশরিকসুলভ যত কর্মকান্ডেই লিপ্ত হোক না কেন, সর্বাবস্থায় সে মুসলমানই থাকবে, এটা হাদীসটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মারাত্মক গোমরাহীর পরিচায়ক।

প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের লোকদের সাথে এ হাদীসের কোন সম্পর্কই নেই। আর এমন লোকদেরকে মুসলমান হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ তো এই হবে যে, ইসলাম কেবল

এইসব বাহ্যিক কর্মকাণ্ড ও নিদর্শনসমূহের নাম। ঈমান ও বিশ্বাসের এতে কোন গুরুত্ব নেই। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, ইসলামের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করার চাইতে চরম মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা আর কিছুই হতে পারে না।

কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে মুসলমান কাফের হয়ে যায় না

(٢٧) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ مِنْ اَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَّلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْاِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُّقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ * (رواه ابوداؤد)

২৭। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় ইসলামের মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) যে ব্যক্তি কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে নিয়েছে, তার ব্যাপারে মুখ সংযত রাখা, অর্থাৎ, কোন গুনাহের কারণে তাঁকে কাফের বলা যাবে না এবং কোন অপকর্মের দরুন তাঁকে ইসলাম থেকে খারিজ মনে করা যাবে না। (২) জেহাদ সেদিন থেকেই অব্যাহত, যেদিন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নবুওয়ত দিয়ে পাঠিয়েছেন, আর তা এ উম্মতের শেষ লোকদের দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, কোন জালেমের অবিচার বা ন্যায়বিচারকের সুবিচার তা বাতিল করতে পারবে না। (৩) তকদীরের প্রতি বিশ্বাস। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তিনটি জিনিসকে ঈমানের মৌলিক বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম এই যে, কোন গুনাহ ও অপকর্মের দরুন এমন কোন ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না এবং তাকে ইসলাম থেকে খারিজ মনে করা যাবে না, যে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'তে বিশ্বাসী।

এ ব্যাপারে একটি কথা তো এই মনে রাখতে হবে যে, কালেমায় বিশ্বাসী হওয়ার মর্ম উহাই, যা পূর্বে বার বার বলা হয়েছে। অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনি দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাওয়া। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কালেমা পাঠ করার অর্থ ছিল ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়া। স্বয়ং আমাদের ভাষার বাকপদ্ধতি অনুযায়ীও কালেমা পড়ার অর্থ ইসলাম গ্রহণ করাই বুঝায়।

এখানে আরেকটি কথা লক্ষণীয় যে, এ হাদীসে কোন গুনাহের কারণে কালেমায় বিশ্বাসী কোন মানুষকে কাফের বলতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন নিজের এ বাণীর দ্বারা উম্মতকে ঐ ভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন, যে গোমরাহীতে মু'তাযেলা ও খারেজীরা লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা কেবল গুনাহ ও অপকর্মের দরুন কাউকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে মনে করত। আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতবাদ এ হাদীস অনুসারে এটাই যে, কোন মুসলমান কেবল নিজের মন্দ আমল ও গুনাহের কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না এবং কাফের হয়ে যায় না।

যাহোক, হাদীসের এ অংশটির দাবী ও মর্ম এই যে, যখন কোন ব্যক্তি কালেমা পাঠ করে ঈমান নিয়ে আসল এবং ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নিল, তখন তার পক্ষ থেকে যদি কোন গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়ে যায় এবং তাকে অপকর্মে লিপ্ত দেখা যায়, তবে তাকে কেবল এই মন্দ কাজের কারণে কাফের ও ইসলাম থেকে খারিজ সাব্যস্ত করা যাবে না। অতএব, ঐসব লোকের সাথে এ হাদীসের কোন সম্পর্ক নেই, যারা ইসলামের এমন কোন বিষয়কে অস্বীকার করে নিজেরাই ইসলামের সীমানা থেকে বাইরে চলে যায়, যার উপর ঈমান আনা মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত।

মনে করুন, এমন ব্যক্তি, যে কালেমা পাঠ করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, কিন্তু কুরআন শরীফ যে আল্লাহ্‌র কিতাব এ কথা সে অস্বীকার করে অথবা কেয়ামত এবং আখেরাতকে বিশ্বাস করে না অথবা খোদায়ী দাবী করে কিংবা নবুওয়াতের দাবী করে, তাহলে এ কথা পরিষ্কার যে, সে মুসলমান থাকবে না। তাকে অবশ্যই কাফের ও ইসলাম থেকে খারিজ বলে গণ্য করা হবে, কিন্তু তাকে এই কাফের বলা কোন মন্দ কাজ ও পাপাচারের কারণে নয়; বরং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে অস্বীকার করার কারণে বলা হবে। তাই এ দুই অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। অনেক মানুষ এ পার্থক্যটির প্রতি লক্ষ্য না রাখার কারণে এ হাদীসটির অপপ্রয়োগ করে থাকে।

এ হাদীসে জেহাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমার নবুওয়াত লাভের যুগ থেকে শুরু করে এ জেহাদ সে পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যখন আমার উম্মতের শেষ দিকের লোকেরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে। কোন জালিমের অবিচার এবং কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের সুবিচার এটা রহিত করতে পারবে না। এ শেষোক্ত কথাটির মর্ম এই যে, যদি কোন সময় মুসলমানদের রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যবস্থাপনা কোন অযোগ্য হাতে পড়ে যায় এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার অযোগ্য ও জালেমও হয়, তাহলেও জেহাদ বাদ দেওয়া যাবে না এবং কারো জন্য এ আপত্তি করা ঠিক হবে না যে, আমরা এ অযোগ্য শাসকের অধীনে জেহাদ করব না। রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শাসনভার ভাল মানুষের হাতেই থাকুক আর মন্দ লোকের হাতেই থাকুক উভয় অবস্থায় তাদের অধীনে জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

দ্বীন ও ঈমানের বিভাগ ও এর শাখাসমূহ

(٢٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ * (رواه البخارى ومسلم)

২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম শাখাটি হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা, অর্থাৎ তওহীদের সাক্ষ্যদান করা, আর সর্বনিম্নটি হচ্ছে রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে ঈমানের শাখাসমূহের জন্য যে 'সত্তরের কিছু উপরে' সংখ্যাটি ব্যবহার করা হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন কোন হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন যে, এর দ্বারা সম্ভবতঃ কেবল আধিক্যই উদ্দেশ্য। আরববাসীগণ কেবল আধিক্য বুঝানোর জন্য 'সত্তর' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করে থাকেন। আর "সত্তরের চাইতে আরো কিছু বেশী" বলে যা যোগ করা হয়েছে, এর দ্বারা আরো আধিক্য উদ্দেশ্য হতে পারে। কিন্তু এ বাক্য দ্বারা অনেকে নির্দিষ্ট সাতাত্তর সংখ্যাও বুঝিয়েছেন। এর ভিত্তি এই যে, 'বিয্উন' শব্দটি নির্দিষ্টভাবে সাত সংখ্যার জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারপর তারা নিজেদের এই মত অনুযায়ী ঈমানের ঐ সাতাত্তরটি শাখা নির্দিষ্ট করে দেখাবার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু এগুলোতে চিন্তা-ভাবনা করার পর এ মতই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এটা কেবল অনুমান ভিত্তিক, যার মধ্যে যথেষ্ট আপত্তির অবকাশ রয়েছে। তাই এ কথাটি বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয় যে, 'সত্তরের কিছু অধিক' শব্দ দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য কোন বিশেষ সংখ্যা বুঝানো নয়; বরং আরবের বাকরীতি অনুযায়ী এখানে কেবল অধিক সংখ্যা ও প্রচুর শাখা বুঝানোই উদ্দেশ্য। তাই এর অর্থ কেবল এই যে, ঈমানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এ অর্থ গ্রহণ করার পক্ষে একটি প্রমাণ এই যে, এখানে 'সত্তরের কিছু অধিক' কথা দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য যদি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা হ্ত, তাহলে তিনি এত অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত কথা বলে ছেড়ে দিতেন না; বরং এর বিস্তারিত আলোচনাও করতেন, যেমনটি অবস্থা ও সময়ের দাবী ছিল।

ঈমানের শাখা-প্রশাখা দ্বারা ঐসব কাজ, স্বভাব এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা উদ্দেশ্য যা কারো অন্তরে ঈমান এসে যাওয়ার পর এর ফল হিসেবে তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া উচিত। সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ থেকে যেমন প্রচুর পাতা ও ডালপালা বের হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে সকল সৎকর্ম, সৎ স্বভাব এবং সুন্দর অবস্থা যেন ঈমানের শাখা-প্রশাখা। তবে এগুলোর স্তর বিভিন্ন হয়ে থাকে।

এ হাদীসে ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হিসাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তথা তওহীদের সাক্ষ্যদানকে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর দিকে সর্বনিম্ন শাখা হিসাবে রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাকে বলা হয়েছে। এখন এ দু'টির মাঝে যত কল্যাণকর জিনিসের কল্পনা করা যেতে পারে, এর সবগুলোই ঈমানের বিভাগ ও এর শাখা-প্রশাখা হিসাবে গণ্য হবে, চাই এগুলোর সম্পর্ক আল্লাহ্র হকের সাথেই হোক অথবা বান্দার হকের সাথে। আর এটা প্রকাশ্য বিষয় যে, এগুলোর সংখ্যা শত শত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে।

হাদীসের শেষে লজ্জা সম্পর্কে যে বলা হয়েছে যে, এটা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর কারণ হয়তো এই হবে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ হাদীসটি বলছিলেন, তখন কারো পক্ষ থেকে লজ্জার ব্যাপারে কোন ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছিল, আর এর সংশোধনের জন্য তিনি এই বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, যেমন প্রজ্ঞাবান শিক্ষক ও সংস্কারকরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। অথবা লজ্জা সম্পর্কে বিশেষভাবে তিনি এ বাণীটি এ কারণে উচ্চারণ করেছেন যে, মানবীয় চরিত্রের মধ্যে লজ্জার স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। আর লজ্জাই এমন এক স্বভাব, যা মানুষকে অনেক গুনাহ্ ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। আর এ কারণে ঈমান ও লজ্জার মধ্যে বিশেষ বন্ধন রয়েছে।

এখানে একথাও জানা দরকার যে, লজ্জা কেবল নিজের সমশ্রেণী থেকে করলেই চলবে না; বরং যার প্রতি আমাদের লজ্জা সবচেয়ে বেশী হওয়া চাই, তিনি হচ্ছেন আমাদের খালেক-মালেক মহান আল্লাহ্ তা'আলা। সাধারণ মানুষ বড় লজ্জাহীন ও বে-আদব ঐ ব্যক্তিকে মনে করে, যে নিজের বড়দের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখে না এবং তাদের সামনে লজ্জাহীনতার কাজ করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সবচেয়ে বড় নির্লজ্জ হচ্ছে ঐ হতভাগা মানুষটি, যে নিজের প্রতিপালক থেকে লজ্জা করে না এবং এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বক্ষণ আমাকে এবং আমার কর্মকাণ্ডকে কোন পর্দার অন্তরায় ছাড়া পর্যবেক্ষণ করছেন এবং আমার কথা-বার্তা সরাসরি শুনে যাচ্ছেন, তাঁর সামনে সে খারাপ কাজ ও অন্যায় আচরণ করে যায়।

অতএব, মানুষের মধ্যে যদি লজ্জা গুণটি পূর্ণরূপে জাগরিত ও কার্যকর হয়, তাহলে কেবল সমশ্রেণী তথা মানুষের দৃষ্টিতেই তার জীবন পবিত্র ও অনাবিল হবে না; বরং তার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী ও অবাধ্যতাও প্রকাশ পাবে না।

তিরমিযী শরীফে একটি হাদীস এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নিজের সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন লজ্জা কর, যেমন লজ্জা তাঁকে করা উচিত। সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, আমরা তাঁকে লজ্জা করেই চলি। তিনি বললেন ঃ এটা নয়; বরং আল্লাহ্কে যথার্থভাবে লজ্জা করার দাবী হচ্ছে এই যে, মাথা এবং মস্তিষ্কে যে চিন্তা ও কল্পনা আসে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে, পেট ও পেটের ভিতর যা কিছু জমা হয়, এর প্রতিও দৃষ্টি রাখবে। (অর্থাৎ, মস্তিষ্ককে কুচিন্তা থেকে এবং পেটকে হারাম ও অবৈধ আহার থেকে হেফাযত করবে।) আর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর কবরে তোমার যে অবস্থা হবে সেটা স্মরণ রাখবে। যে ব্যক্তি এসব কিছু করে নিল, তার ব্যাপারে মনে করে নাও যে, সে আল্লাহ্কে যথার্থভাবে লজ্জা করতে শিখেছে।

ঈমানের কয়েকটি লক্ষণ

(٢٩) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ * (رواه احمد)

২৯। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ঈমানের নিদর্শন কি ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমার পুণ্য কাজ যখন তোমাকে আনন্দ দান করে আর তোমার মন্দ কাজ যখন তোমাকে দুঃখ দেয়, তখন মনে করে নাও যে, তুমি মু'মিন। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, ঈমানের বিশেষ প্রভাব ও নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটিও একটি নিদর্শন যে, মানুষ যখন কোন ভাল কাজ করে, তখন সে মনে আনন্দ অনুভব করে। আর যখন তার পক্ষ থেকে কোন গুনাহ ও মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, তখন সে অন্তরে দুঃখ ও ব্যথা অনুভব করে। যে পর্যন্ত মানুষের বিবেকের মধ্যে এই অনুভূতি অবশিষ্ট থাকবে, তখন বুঝতে হবে যে, ঈমানী আত্মা এখনও জীবিত আছে, আর এই অনুভূতিটি এরই ফল ও ফসল।

ঈমানকে পূর্ণতা দানকারী উপাদানসমূহ

(٣٠) عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا * (رواه مسلم)

৩০। হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ঈমানের স্বাদ ঐ ব্যক্তি পেয়েছে, যে আল্লাহ্‌কে নিজের রব, ইসলামকে নিজের দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে নিজের রাসূল ও পথপ্রদর্শক হিসাবে মেনে নিতে রাজী হয়ে গিয়েছে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়টি এভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, সুস্বাদু ও মজাদার খাবারসমূহে যেমন একটা বিশেষ মজা থাকে, আর এ স্বাদ ও মজা কেবল ঐ ব্যক্তিই লাভ করতে পারে, যার আস্বাদনশক্তি কোন রোগের কারণে নষ্ট হয়ে যায়নি, অদ্রূপভাবে ঈমানের মধ্যেও এক বিশেষ স্বাদ ও মজা রয়েছে। কিন্তু এ ঈমানী স্বাদ কেবল ঐসব ভাগ্যবান লোকেরাই লাভ করতে পারবে, যারা মনের খুশী ও অন্তরের সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহ্‌কে নিজের প্রভু পরওয়ারদেগার, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন নবী ও রাসূল এবং দ্বীন ইসলামকে নিজের দ্বীন ও জীবনবিধান বানিয়ে নিয়েছে। যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র গোলামী, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য এবং ইসলামী জীবনধারার অনুসরণকে আপন করে নিয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক কেবল প্রথাগত অথবা পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত বস্তুর মত অথবা কেবল জ্ঞানগত ও বুদ্ধিগত হলেই চলবে না; বরং এগুলোর সাথে আন্তরিক বশ্যতা ও প্রেমও থাকতে হবে। এ কথাটিই হাদীসে 'রাজী হয়ে গিয়েছে' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, তার জন্য ঈমানী স্বাদ ও মজারও কোন অংশ নেই, আর তার ঈমানও পরিপূর্ণ নয়।

(٣١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ * (رواه البخارى و مسلم)

৩১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তিই পাবে, যার মধ্যে তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে ঃ (১) আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ভালবাসা তার কাছে সকল জিনিসের চেয়ে বেশী হবে। (২) যার সাথেই তার ভালবাসা হবে, তা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই হবে। (৩) ঈমানের পর কুফরীতে ফিরে যাওয়া তার নিকট এমন কষ্টদায়ক মনে হবে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন কষ্টদায়ক মনে হয়ে থাকে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটির বিষয়বস্তুও প্রায় পূর্ববর্তী হাদীসের ন্যায়, কেবল বর্ণনাভঙ্গীর সামান্য পার্থক্য রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, ঈমানের স্বাদ সে ব্যক্তিই লাভ করতে পারবে, যে আল্লাহ্ এবং রাসূলের ভালবাসায় এমন মত্ত হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ এবং রাসূলের ভালবাসা

সবকিছুর চেয়ে প্রবল থাকে এবং এ ভালবাসা এমন একচ্ছত্রভাবে তার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যায় যে, সে যদি অন্য কাউকেও ভালবাসতে চায়, তাহলে সেটাও আল্লাহ্‌র জন্যই করে থাকে। আর আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলাম তার কাছে এমন প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়ে যায় যে, সেখান থেকে ফিরে আসার কল্পনাও তার কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত কষ্টদায়ক মনে হয়।

(٣٢) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ * (رواه ا لبخارى ومسلم)

৩২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও অপরাপর সকল মানুষ থেকে অধিকতর প্রিয় না হই। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, ঈমানের পরিপূর্ণতা তখনই হতে পারে, তথা একজন মুসলমান পূর্ণ মু'মিন তখনই হতে পারে, যখন দুনিয়ার সকল মানুষ থেকে এমনকি নিজের পিতা-মাতা ও সন্তানাদি থেকেও বেশী ভালবাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি থাকবে।

এর আগের হাদীসটিতে অন্য সকলের চাইতে আল্লাহ্‌র ভালবাসা, রাসূলের ভালবাসা ও ইসলামের ভালবাসা অধিক হওয়াকে ঈমানের স্বাদ লাভের পূর্বশর্ত বলা হয়েছে। আর এ হাদীসে কেবল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ এবং রাসূলের ভালবাসা এবং ইসলামের ভালবাসার মধ্যে এমন সম্পর্ক রয়েছে যে, এর একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং ইসলামের প্রতি খাঁটি ভালবাসা আল্লাহ্‌র রাসূলের ভালবাসা ছাড়া সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র এবং ইসলামের ভালবাসা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার কল্পনাও করা যায় না। কেননা, রাসূলের প্রতি যে ভালবাসা রাসূল হিসাবে হবে, সেটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের কারণেই হবে। আর এর অপরিহার্য ফল এ হবে যে, ইসলামের প্রতিও তার পূর্ণ ভালবাসা থাকবে। এ জন্য এ হাদীসে ঈমানের পূর্ণতার জন্য কেবল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মর্ম উহাই যে, ঈমানের আলো ও এর বরকত কেবল ঐ ভাগ্যবানরাই লাভ করতে পারবে, যাদের অন্তরে আল্লাহ্ এবং রাসূলের ভালবাসা এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা এমন প্রবল যে, এর সামনে অন্য সকল ভালবাসা পরাভূত হয়ে যায়।

এ হাদীসসমূহে আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতি ভালবাসার যে দাবী উল্লেখ করা হয়েছে, এর মর্ম নির্ধারণে হাদীস ব্যাখ্যাতাদের বক্তব্য অভিন্ন নয়। যে কারণে অনেকের পক্ষে এর মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝে উঠা কঠিন হয়ে পড়েছে, অথচ যে বাস্তবতাটি এ হাদীসসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও সহজ। ভালবাসা একটি পরিচিত শব্দ, আর এর অর্থও সুবিদিত, আর সে অর্থই এখানে উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথে মু'মিনদের যে ভালবাসা হয়ে থাকে, সেটা পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্রদের ভালবাসার ন্যায় রক্তের সম্পর্ক অথবা অন্য কোন

সহজাত প্রবৃত্তির কারণে হয় না; বরং আত্মিক ও জ্ঞান বিবেচনায় হয়ে থাকে। আর এই ভালবাসা যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন এর বাইরে অন্যান্য ভালবাসা যা মানুষের স্বভাবগত চাহিদা অথবা প্রবৃত্তির কারণে হয়ে থাকে, সেটা এর সামনে পরাজিত ও পরাভূত হয়ে যায়। এ কথাটি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিই বুঝতে পারে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা এর কিছুটা অংশ দিয়ে থাকেন।

সারকথা, এসব হাদীসে ভালবাসা দ্বারা অন্তরের ঐ অবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে, যা ভালবাসা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে, আর আমাদের কাছে এ জিনিসটিরই দাবী করা হয়েছে। আসলে এ জিনিসটিই আমাদের ঈমানের প্রাণতুল্য। কুরআন মজীদেও এরশাদ হয়েছে ঃ "ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী ভালবাসা আল্লাহ্র প্রতিই রাখে।" (সূরা বাকারা) অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ "হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই-বেরাদর, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের গোত্র, তোমাদের কষ্টার্জিত সম্পদ, তোমাদের ঐ চালু ব্যবসা, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ কর, (দুনিয়ার এসব পছন্দনীয় ও আকর্ষণীয় জিনিসসমূহ) আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ্র হুকুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা তওবা)

অতএব, পবিত্র কুরআনের এ মহত্বপূর্ণ আয়াতের দাবী ও আবেদনও এটাই যে, ঈমানদারদের অন্তরে তাদের সকল প্রিয় জিনিসের চেয়ে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের ভালবাসা বেশী থাকতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর বিশেষ হেদায়াত লাভ করা সম্ভব হবে না এবং ঈমানের পূর্ণতাও লাভ করা যাবে না।

এটা প্রকাশ্য বিষয় যে, যে ব্যক্তি এ সম্পদ ও সৌভাগ্য অর্জন করে নিতে পারবে, তার জন্য ঈমানের সকল দাবী পূরণ করা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানের উপর চলা কেবল সহজই হবে না; বরং এ পথে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও সে অন্তরে স্বাদ অনুভব করবে। পক্ষান্তরে যার অন্তরে আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসার এই প্রাবল্য থাকবে না, তার জন্য প্রাত্যহিক ইসলামী বিধান পালন ও ঈমানের সাধারণ দাবী পূরণও কঠিন মনে হবে। সে এ পথে যতটুকু করবে, সেটা কেবল আইন পালন হিসাবেই করবে। এর বেশী কিছু তার কাছে আশা করা যায় না। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং রাসূলের ভালবাসা অন্য সকল ভালবাসার উপর জয়ী না হবে, সে পর্যন্ত ঈমানের প্রকৃত মর্তবা লাভ করা সম্ভব হবে না এবং ঈমানের স্বাদ এবং মজাও পাওয়া যাবে না।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার ভালবাসা, তোমার রাসূলের ভালবাসা এবং ঐ কাজের ভালবাসা দান কর, যা আমাদেরকে তোমার ভালবাসা লাভে ধন্য করবে।

(٣٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ * (رواه البغوى فى شرح السنة)

৩৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত হেদায়াতের বশীভূত না হয়ে যায়। —শরহুস্সুন্নাহ্

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, প্রকৃত ঈমান তখনই লাভ হতে পারে এবং ঈমানের বরকতসমূহ তখনই ভাগ্যে জুটতে পারে, যখন মানুষের অন্তরের ঝোঁক এবং মনের চাহিদাসমূহ সম্পূর্ণরূপে নবীর হেদায়াত ও দিকনির্দেশনার অধীন ও বাধ্যগত হয়ে যাবে।

এ হাদীসে উল্লেখিত দু'টি শব্দ 'হাওয়া'এবং 'হুদা' সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশক। 'হাওয়া'র অর্থ হচ্ছে প্রবৃত্তি আর 'হুদা'র অর্থ হচ্ছে নবী-রাসূল কর্তৃক আনীত হেদায়াত। এ দু'টি এমন জিনিস যে, এগুলোর উপরই কল্যাণ ও অকল্যাণের ভিত্তি রচিত হয়ে থাকে। প্রতিটি পথভ্রষ্টতা ও পাপাচার 'হাওয়া'কে অনুসরণ করার ফল। অপরদিকে সকল কল্যাণ ও পুণ্য 'হুদা'র অনুসরণ দ্বারা লাভ হয়ে থাকে। তাই প্রকৃত ঈমান তখনই ভাগ্যে জুটবে, যখন 'হাওয়া' অর্থাৎ, প্রবৃত্তিকে 'হুদা' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত হেদায়াত ও শিক্ষার অনুগত করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি 'হুদা'কে ছেড়ে দিয়ে 'হাওয়া'র দাসত্ব অবলম্বন করবে, সে যেন নিজেই ঈমানের উদ্দেশ্যকে পদদলিত করে ফেলল।

কুরআন পাকে এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আপন প্রবৃত্তিকেই খোদা বানিয়ে নিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ "আপনি কি ঐ সব হতভাগাদেরকে দেখেছেন, যারা নিজেদের নফ্সের খাহেশ তথা প্রবৃত্তিকেই আপন মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে ? (সূরা ফুরকান)

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াতকে বাদ দিয়ে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে ? আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা কাছাছ)

(٣٤) عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ * (رواه البخارى و مسلم)

৩৪। হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে আপন ভাইয়ের জন্য তাই কামনা করে, যা নিজের জন্য কামনা করে থাকে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, ঈমানের কাংখিত স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে হলে এবং এর বিশেষ বরকত লাভ করতে চাইলে এটাও জরুরী যে, মানুষ স্বার্থপরতা থেকে পবিত্র থাকবে। তার অন্তরে নিজের অন্যান্য ভাইদের প্রতি এতটুকু কল্যাণকামিতা থাকবে যে, যেসব নেয়ামত, কল্যাণ এবং মঙ্গল সে নিজের জন্য কামনা করে, অন্যান্য ভাইদের জন্যও সেটাই কামনা করবে। আর যে বিষয় ও যে অবস্থা সে নিজের জন্য পছন্দ করে না, অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে না। এই গুণটি ছাড়া ঈমানের মধ্যে পূর্ণতা আসতে পারে না।

ইবনে হিব্বান বর্ণিত এ হাদীসেই "তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না" স্থলে এ শব্দমালা এসেছে ঃ "কোন মানুষ ঈমানের কাংখিত স্তরে পৌঁছতে পারবে না।" এর দ্বারা এই কথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, এ হাদীসে এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসে যে 'মু'মিন হতে পারবে না' কথাটি বলা হয়েছে, এর দ্বারা মূল ঈমানের অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য নয়; বরং ঈমানের পূর্ণতার অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ, সে পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না।) কোন অপূর্ণ জিনিসকে অস্তিত্বহীন সাব্যস্ত করে এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার রেওয়াজ প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই রয়েছে।

যেমন, আমাদের ভাষায়ও কোন খারাপ ও অসভ্য মানুষের বেলায় বলে দেওয়া হয়, এর মধ্যে তো মনুষ্যত্বই নেই অথবা এমন বলা হয়, 'এতো মানুষই নয়।' অথচ এর অর্থ এ হয় যে, সে কোন ভাল এবং মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ নয়। তাই এ রীতি অনুযায়ীই অনেক হাদীসে ঈমানের অপূর্ণতাকে 'ঈমান নেই' অথবা 'মু'মিন হতে পারবে না' বলে প্রকাশ করা হয়েছে। আর কাউকে দীক্ষাদান ও উপদেশ দানের ক্ষেত্রে এ বর্ণনাভঙ্গীটিই সবচেয়ে উপযোগী ও উত্তম মনে করা হয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রে যুক্তিবিজ্ঞানীদের মত তত্ত্বালোচনায় লিপ্ত হওয়া আসলে নবুওতের মেযাজ ও স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং রুচিহীনতার প্রমাণ।

(٣٥) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ اَنَّهٗ سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَفْضَلِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَ تُبْغِضَ لِلّٰهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِى ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ * (رواه احمد)

৩৫। মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমানের সর্বোত্তম বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। (অর্থাৎ, ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্তর কোন্‌টি এবং কোন্ আমল ও আখলাক দ্বারা সেটা লাভ করা যায়?) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ভালবাসবে এবং আল্লাহ্‌র জন্যই শত্রুতা পোষণ করবে, (অর্থাৎ, যার সাথেই তোমার মিত্রতা অথবা শত্রুতা থাকবে সেটা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই হওয়া চাই।) এবং নিজের রসনাকে তুমি আল্লাহ্‌র যিকিরে লাগিয়ে রাখবে। মো'আয (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর কি? তিনি বললেন ঃ অন্য মানুষের জন্যও তুমি তাই কামনা করবে, যা নিজের জন্য কামনা কর, আর তাদের জন্য তাই অপছন্দ করবে, যা নিজের জন্য অপছন্দ কর। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মো'আয (রাঃ)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি জিনিসের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমান তখনই ভাগ্যে জুটবে, যখন মানুষের মধ্যে এ তিনটি গুণ সৃষ্টি হয়ে যায় ঃ (১) আল্লাহ্‌র জন্যই কারো সাথে মিত্রতা অথবা শত্রুতা। (২) রসনাকে আল্লাহ্‌র যিকিরে ব্যস্ত রাখা। (৩) আল্লাহ্‌র বান্দাদের এমন কল্যাণ কামনা করবে যে, নিজের জন্য যা চাইবে, অন্য সবার জন্যও তাই চাইবে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে, তা অন্য কারো জন্যই পছন্দ করবে না।

(٣٦) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَ اَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِاسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ * (رواه ابوداؤد)

৩৬। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ভালবাসে, আল্লাহ্‌র জন্যই কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে, কাউকে কিছু দিলে আল্লাহ্‌র জন্যই দিয়ে থাকে এবং কাউকে বঞ্চিত করলে আল্লাহ্‌র জন্যই বঞ্চিত করে, সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিয়েছে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি নিজের সকল গতি ও বিরতি এবং নিজের সকল আবেগ অনুভূতিকে এমনভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অধীন করে দিয়েছে যে, সে যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তা স্থাপন করে, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র জন্যই ছিন্ন করে, যাকে কিছু দান করে, আল্লাহ্‌র জন্যই দান করে এবং যার নিকট থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই গুটিয়ে নেয়। এক কথায় যার ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল আন্তরিক অনুরাগ ও আবেগ, যেমন মিত্রতা ও শত্রুতা এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল বাহ্যিক কর্মকাণ্ড যেমন কাউকে কিছু দেওয়া অথবা না দেওয়া এসব কিছুই যখন কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হতে শুরু করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া এর পেছনে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বা কার্যকারণ থাকে না। সারকথা, আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক এবং পূর্ণ দাসত্বসুলভ আচরণের এই স্তর যে অর্জন করে নিয়েছে, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে।

(٣٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِىْ ذَرٍّ اَىُّ عُرَى الْاِيْمَانِ اَوْثَقُ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَلْمُوَالَاةُ فِى اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৩৭। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ যর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বল তো, ঈমানের কোন্ হাতলটি বেশী মজবুত ? (অর্থাৎ, ঈমানের কোন্ শাখাটি বেশী স্থায়িত্বশীল ?) আবূ যর উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। (তাই আপনিই বলুন।) তিনি তখন বললেন ঃ আল্লাহ্‌র জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করা। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, ঈমানী কর্মকাণ্ড ও অবস্থাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও দীর্ঘস্থায়ী আমল ও অবস্থা হল, দুনিয়াতে বান্দার সাথে বান্দার যে আচরণ হবে, তা সহযোগিতাই হোক অথবা অসহযোগিতা, ভালবাসাই হোক বা শত্রুতা, এটা প্রবৃত্তির তাড়না অথবা মনের আবেগে হবে না; বরং কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই নির্দেশের অধীনে হবে।

(٣٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ * (رواه مسلم)

৩৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত ঈমানের অধিকারী না হবে। আর তোমরা পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের একজন অপরজনকে ভাল না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের কথা বলে দিব না, যার উপর আমল করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হবে ? সে বিষয়টি হচ্ছে, তোমরা তোমাদের মাঝে ব্যাপকভাবে সালামের রেওয়াজ চালু করবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরের হাদীসসমূহ থেকে বুঝা গিয়েছিল যে, কোন বান্দার ঈমানের পূর্ণতার জন্য এটা জরুরী যে, তার মধ্যে আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতি এবং দ্বীনের প্রতি সবচেয়ে বেশী ভালবাসা থাকতে হবে এবং তাঁদের বাইরে যার সাথেই ভালবাসা হোক, এটা তাদের সম্পর্কের কারণেই হতে হবে। আর বান্দার অন্তর স্বার্থপরতা থেকে পবিত্র থাকতে হবে এবং তার অবস্থা এ হতে হবে যে, সে নিজের জন্য যা চাইবে, অপরের জন্যও তাই কামনা করবে, নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে, অন্যের জন্যও তা অপছন্দ করবে। এখন এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, ঈমানের দাবিদার কোন জাতি ও কোন সমাজের ঈমানের পূর্ণতার জন্য এটাও জরুরী যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহমর্মিতা থাকবে। তাদের একজনের অন্তর যদি অপরজনের ভালবাসা থেকে শূন্য থাকে, তাহলে মনে করতে হবে যে, এরা ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ ও এর বরকত ও সুফল থেকে বঞ্চিত।

(٣٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ * (رواه الترمذى والنسائى)

৩৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার মুখের অনিষ্ট ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আর মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার পক্ষ থেকে মানুষ তাদের জীবন ও সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। —তিরমিযী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে কেবল মুখ ও হাতের কথা এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কষ্ট দেওয়ার কাজটি এ দু'টি অঙ্গের দ্বারাই হয়ে থাকে। অন্যথায় হাদীসটির মর্ম ও উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই যে, মুসলমানের মর্যাদার দাবী এটাই যে, তার দ্বারা মানুষের কোন প্রকার কষ্ট হবে না।

ইবনে হিব্বানের রেওয়ায়াতে এই হাদীসেই 'মুসলমান নিরাপদ থাকে' শব্দের স্থলে 'মানুষ নিরাপদ থাকে' বাক্য এসেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, একজন মুসলমান থেকে সমগ্র মানবজাতিই নিরাপদ ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকবে।

কিন্তু একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, এখানে যে কষ্ট দেওয়াকে ইসলাম পরিপন্থী বলা হয়েছে। সেটা হচ্ছে ঐ কষ্ট যা যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ও শরয়ী কোন ভিত্তি ছাড়া দেওয়া হয়। অন্যথায় শক্তি থাকলে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়া, জালেমদের অন্যায়, বাড়াবাড়ি ও দুষ্কৃতিকারীদের দুষ্কৃতিকে শক্তি প্রয়োগে দমন করা, এটা তো মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। এটা না করলে পৃথিবী থেকে শান্তি ও নিরাপত্তাই বিদায় নিয়ে যাবে।

(٤٠) عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لَا يَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ * (رواه البخارى)

৪০। আবূ শুরাইহ্ খুযায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম, ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহ্র কসম ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহ্র

কসম ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে মু'মিন নয় ? তিনি বললেনঃ ঐ ব্যক্তি, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তাবোধ করে না। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ নিজের প্রতিবেশীদের সাথে এমন সুন্দর আচরণ ও ভদ্র ব্যবহার করা চাই, যাতে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকে। কোন অন্যায়-অবিচার ও অনিষ্টের আশংকা যেন তাদের অন্তরে স্থান না পায়। এটা ঈমানের ঐসব শর্ত ও অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো ব্যতীত ঈমান যেন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তুমি নিজ প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার কর, মু'মিন হতে পারবে। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী) অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। —বুখারী, মুসলিম

(٤١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৪১। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে নিজে পেট ভরে খায়, আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী উপোস করে দিন কাটায়। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ নিজের প্রতিবেশীর ক্ষুধা ও উপবাস থেকে উদাসীন থেকে যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে আহার করে, সে (সত্তর পুরুষ থেকে মুসলমান হলেও) ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ থেকে বঞ্চিতই রয়েছে। তার এই পাষাণ হৃদয় ও স্বার্থপরতার অবস্থাটি ঈমানের মর্যাদার সম্পূর্ণ বিপরীত।

[আমরা মুসলমান হয়ে নিজেদের প্রতিবেশীদের সাথে এবং আল্লাহ্র সাধারণ বান্দাদের সাথে যে আচরণ ও ব্যবহার করে থাকি সেটা সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণীর আলোকে আমরা যেন নিজেদের ঈমানের একটু পরীক্ষা নিয়ে দেখি যে, এসব হাদীসের আলোকে আমাদের অবস্থান কোথায়, আমরা কোথায় আছি।]

(٤٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا * (رواه ابوداؤد والدارمى)

৪২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল। —আবূ দাউদ, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, ঈমানের পূর্ণতা সুন্দর চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তাই যে যত উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে, তার ঈমানও ততটুকু পূর্ণাঙ্গ হবে। কথাটি এভাবেও বলতে পারেন যে, চরিত্র মাধুর্য ঈমানের পরিপূর্ণ অনিবার্য ফল ও ফসল। তাই যার ঈমান যতটুকু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে, সেই অনুসারে তার চরিত্রও উন্নত হবে। এটা হতেই পারে না যে, এক ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ অর্জন করে নিবে, অথচ তার চরিত্র ভাল হবে না।

(٤٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَالَا يَعْنِيْهِ * (رواه ابن ماجة والترمذى والبيهقى فى شعب الايمان)

৪৩। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের ইসলামী জীবনাচারের একটি সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য এই যে, সে উদ্দেশ্যহীন ও অহেতুক কথা ও কাজ পরিহার করে চলে। —ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ আশরাফুল মখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে খুবই দামী বানিয়েছেন। তিনি চান যে, মানুষকে সময় ও যোগ্যতার যে সম্পদ দান করা হয়েছে, তা যেন তারা কোনভাবেই নষ্ট না করে; বরং যথাযথভাবে তা কাজে লাগিয়ে অধিক উন্নতি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করে। এটাই হচ্ছে দ্বীনের সকল শিক্ষার সার এবং এটাই হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের উদ্দেশ্য। তাই যে ভাগ্যবান ব্যক্তি এটা কামনা করে যে, তার ঈমানে পূর্ণতা আসুক এবং তার ইসলামে কোন দাগ ও আবিলতা না থাকুক, তার জন্য একান্ত জরুরী হচ্ছে প্রকাশ্য গুনাহ এবং চারিত্রিক অধঃপতন থেকে আত্মরক্ষা ছাড়াও সকল অহেতুক ও উদ্দেশ্যহীন কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা এবং নিজের মূল্যবান সময় ও খোদাপ্রদত্ত শক্তি এবং যোগ্যতাকে কেবল এইসব কাজে ব্যয় করা, যার মধ্যে কল্যাণ ও লাভের কোন দিক রয়েছে অর্থাৎ, যা আখেরাতের উন্নতি সাধনে অথবা দুনিয়ার জীবনধারণের জন্য জরুরী ও উপকারী। এটাই এই হাদীসের মর্ম।

যেসব লোক অবহেলার দরুন অহেতুক কথা ও কর্মে নিজের মূল্যবান সময় এবং নিজের মেধা ও শক্তি ব্যয় করে দেয়, এ মূর্খরা জানেই না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কত দামী বানিয়েছেন। তারা এটাও জানে না যে, কি মূল্যবান রত্ন-ভাণ্ডার তারা ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছেন। এ সত্যটি যারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তারাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং তারাই নিজেদেরকে মূল্যায়ন করতে শিখেছেন।

(٤٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ اُمَّةٍ قَبْلِىْ اِلَّا كَانَ لَهٗ مِنْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَ اَصْحَابٌ يَاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَ يَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ وَ يَفْعَلُوْنَ مَالَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ * (رواه مسلم)

৪৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন উম্মতের মধ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, সেই উম্মতের মধ্যে তাদের কিছু ঘনিষ্ট সহচর ও যোগ্য সাথী থাকত, যারা তাঁদের আদর্শের উপর চলত এবং তাঁদের নির্দেশের অনুসরণ করত। তারপর এমন হত যে, তাদের অযোগ্য উত্তরসূরীরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যেত। তাদের অবস্থা এ ছিল যে, তারা যা বলত তা নিজেরা করত না। (অর্থাৎ, অন্য লোকজনকে তো ভাল কাজ করতে বলত, কিন্তু নিজেরা

তা করত না অথবা অর্থ এই যে, ভাল কাজ তো তারা করত না, কিন্তু মানুষকে বলত যে আমরা তা করে থাকি। এভাবে যেন তারা নিজেদের বুযুর্গী ও পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য মিথ্যার আশ্রয়ও নিত।) আর যে কাজের নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়নি সেটাই করত। (অর্থাৎ, তারা নিজেদের নবী-রাসূলের আদর্শ ও তাদের আদেশ-নিষেধের উপর তো আমল করত না, কিন্তু যেসব পাপাচার ও বেদআতের হুকুম দেওয়া হয়নি সেগুলো তারা খুব বেশী করেই করত।) তাই যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জেহাদ করেছে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি (অপারগ অবস্থায়) শুধু মুখ দিয়ে জেহাদ করেছে সেও মু'মিন। আর যে ব্যক্তি (মুখের জেহাদ থেকেও অপারগ হয়ে) শুধু অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছে (অর্থাৎ, অন্তর দ্বারা তাদেরকে ঘৃণা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্তরে ক্ষোভ ও ক্রোধ পোষণ করেছে) সেও মু'মিন। (এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর) এর নীচু স্তরে আর সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও নেই। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম ও এর প্রাণ এটাই যে, নবী-রাসূল এবং বুযুর্গানে দ্বীনের স্থলবর্তী ও তাদের ভক্তদের মধ্যে যারা ভুল পথের যাত্রী এবং দুষ্কর্মপরায়ণ, যারা অন্যদেরকে তো নেক কাজের দাওয়াত দেয়; কিন্তু নিজেরা আমল করে না অথবা বদ আমলে লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে সাধ্য অনুযায়ী হাত দিয়ে অথবা মুখ দিয়ে জেহাদ করা অথবা কমপক্ষে অন্তরে এ জেহাদের ইচ্ছা পোষণ করা ঈমানের বিশেষ শর্ত ও অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরেও এ জেহাদের প্রেরণা অনুভব করে না, তার অন্তর ঈমানী জোশ এবং হৃদয়ের উত্তাপ থেকে একেবারে শূন্য। হাদীসে বর্ণিত 'এর নীচে আর সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও নেই' কথাটির মর্ম এটাই। সামনের হাদীসে এটাকেই 'ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর' বলা হয়েছে।

স্মরণযোগ্য যে, নবী-রাসূল এবং দ্বীনের পূর্বসূরীগণের অযোগ্য স্থলবর্তীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার যে নির্দেশ রয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে সংশোধন ও সুপথে আনার চেষ্টা করতে হবে। তারপরও যদি নৈরাশ্যই দেখা দেয়, তাহলে তাদের মন্দ প্রভাব থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের মিথ্যা দেবত্ব ও তাদের পৈত্রিক প্রভাব ও কর্তৃত্বকে শেষ করে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(٤٥) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ * (رواه مسلم)

৪৫। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন গর্হিত ও শরীঅতবিরোধী কাজ হতে দেখবে, তার কর্তব্য হচ্ছে (শক্তি থাকলে) তা হাত দিয়ে প্রতিহত করা, তা না পারলে মুখ দিয়ে এর প্রতিবাদ করা। এটাও সম্ভব না হলে অন্ততঃ অন্তর দিয়ে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করা, আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম স্তর। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এর পূর্ববর্তী হাদীসে একটা বিশেষ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর অপকর্মের বিরুদ্ধে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধের চেষ্টাকে ঈমানের অপরিহার্য দাবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ হাদীসে সকল অপকর্ম ও মন্দ কাজকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য ব্যাপক নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। উপরে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় এখানেও এর তিনটি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে ঃ (১) যদি শক্তি ও ক্ষমতা থাকে এবং এর দ্বারা এটা প্রতিহত করা সম্ভব হয়, তাহলে শক্তি প্রয়োগ করে তা প্রতিহত করতে হবে। (২) যদি নিজের হাতে ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মৌখিকভাবে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ও উপদেশের মাধ্যমে এটাকে ফিরানোর এবং সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। (৩) যদি অবস্থা এমন প্রতিকূল হয় এবং দ্বীনদার লোকেরা এমন দুর্বল অবস্থানে থাকে যে, এ মন্দ কাজের বিরুদ্ধে মুখ খোলারও অবকাশ নাই, তাহলে শেষ স্তর হচ্ছে ইহাই যে, মনে মনে এটাকে ঘৃণা করতে হবে এবং এর প্রতিবিধানের প্রেরণা অন্তরে রাখতে হবে। যার অনিবার্য ফল অন্ততঃ এতটুকু হবে যে, অন্তর সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দু'আ করতে থাকবে এবং কৌশল অবলম্বনের কথাও চিন্তা করবে। এই শেষ স্তরটিকে হাদীসে 'ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এটা হচ্ছে ঈমানের ঐ শেষ ও দুর্বল স্তর, যার পরে ঈমানের আর কোন স্তরই হতে পারে না। এ কথাটিই প্রথম হাদীসটিতে অন্য শব্দমালায় বলা হয়েছে।

এ হাদীসের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলমানের উপর এটা ওয়াজিব যে, তার সামনে যদি এ ধরনের কোন অপকর্ম হয়, যা শক্তি ও বল প্রয়োগে প্রতিহত করা যায়, তাহলে শক্তি থাকলে সেটা প্রয়োগ করেই তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। যদি হাতে প্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকে, তা হলে মুখে বুঝিয়ে শুনিয়ে এখানে কাজ নেবে। আর অবস্থা যদি একেবারেই প্রতিকূল হয়, তাহলে কমপক্ষে অন্তরে এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ব্যথা হলেও রাখবে।

(٤٦) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا قَالَ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৪৬। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এমন খুব কমই হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দিয়েছেন আর এতে তিনি একথা বলেননি ঃ যার মধ্যে আমানত রক্ষার চরিত্র নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিজ্ঞা রক্ষার মনোবৃত্তি নেই, তার মধ্যে দ্বীন নেই। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ আমানতদারী ও প্রতিজ্ঞা রক্ষার মনোবৃত্তি থেকে কোন মানুষের অন্তর শূন্য থাকা দ্বীন ও ঈমান থেকে তার বঞ্চিত থাকারই প্রমাণ। কেননা, আমানত রক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পালন ঈমান ও ইসলামের অপরিহার্য দাবীসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

ইতোপূর্বেও অনেক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ ধরনের হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য এ নয় যে, এমন ব্যক্তি ইসলামের সীমানা থেকে বের হয়ে যায় এবং তার উপর ইসলামের পরিবর্তে কুফরের বিধান জারী করা যায়; বরং এর মর্ম কেবল ইহাই যে, এ ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ ও এর আলো থেকে বঞ্চিত। আর এর ফল এ দাঁড়ায় যে, তার ঈমান খুবই দুর্বল এবং প্রাণহীন হয়ে যায়।

ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক চরিত্র ও কর্মসমূহ

(٤٧) عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْاِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৪৭। বাহ্য ইবনে হাকীম নিজের পিতার সূত্রে আপন দাদা মু'আবিয়া ইবনে হায়দাহ কুশায়রী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রোধ ও গোস্বা ঈমানকে এভাবে বিনষ্ট করে দেয়, যেমন মুছাব্বর মধুকে বিনষ্ট করে দেয়। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃতপক্ষে রাগ-গোস্বা এমন ঈমানবিধ্বংসী জিনিস যে, যখন কারো উপর এটা চেপে বসে, তখন সে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যায় এবং তার মুখ দিয়ে এমন কথা বের হয়ে যায়, যা তার দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করে দেয় এবং আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের দৃষ্টি থেকে সে মাহরূম হয়ে যায়।

(٤٨) عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهٗ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৪৮। আউস ইবনে শুরাহ্‌বীল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জালেমের সহায়তার জন্য তার সাথে গেল, অথচ সে জানে যে, এই ব্যক্তিটি জালেম, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ যখন জুলুমে অংশীদার হওয়া এবং জেনে শুনে জালেমের সহায়তা করা এত বড় গুনাহ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে আখ্যায়িত করেন, তাহলে বুঝে নেয়া যায় যে, স্বয়ং জুলুম ঈমান ও ইসলামের কতটুকু পরিপন্থী এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের দৃষ্টিতে জালিমের স্থান কোথায়।

(٤٩) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَاالْفَاحِشُ وَلَا الْبَذِئُ * (رواه الترمذى والبيهقى فى شعب الايمان)

৪৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি ভর্ৎসনাকারী হয় না, অভিসম্পাতকারীও হয় না, অশ্লীল এবং কটুভাষীও হয় না। —তিরমিযী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, কটুভাষা প্রয়োগ করা, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা এবং অপরের সাথে মুখ বাড়াবাড়ি করা, এ অভ্যাসগুলো ঈমানের পরিপন্থী। মুসলমানকে এগুলো থেকে পবিত্র থাকতে হবে।

(٥٠) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ اَنَّهٗ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهٗ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا قَالَ نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهٗ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا * (رواه مالك والبيهقى فى شعب الايمان مرسلا)

৫০। ছফওয়ান ইবনে সুলাইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুসলমান কি ভীরু হতে পারে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ